এক : প্রাচীন ভারতের নাট্যচেতনা ।।

' নাট্যশাস্ত্র ' নাট্যোৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে আচার্য ভরত বলেছেন , বৈবস্বত মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের আরম্ভ হলে জনগণ' গ্রাম্যধর্মপ্রবৃত্ত' হয়ে কাম ও লোভের বশবর্তী হল । তাদের অন্তর ঈর্ষা ও ক্রোধানলে পূর্ণ হল । তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন , পিতামহ এমন একটি ক্রীড়নীয়ক বস্তু রচনা করুন যা যুগপৎ দৃশ্য এবং শ্রব্য হবে । বেদ শূদ্রজাতির শ্রোতব্য নয় , কিন্তু অতিরিক্ত পঞ্চম বেদটি হবে 'সার্ববর্ণিক' অর্থাৎ সকল বর্ণের শ্রবণ , দর্শন ও উপভোগের যোগ্য । দেবগণকে বিদায় দিয়ে ব্রহ্মা যোগস্থ হয়ে চতুর্বেদকে স্মরণ করলেন এবং চতুর্বেদ মন্থন করে ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্যবস্তু , সামবেদ থেকে গান , যজুর্বেদ থেকে অভিনয় ও অথর্ববেদ থেকে রসসমূহ নিয়ে নাট্যবেদ বা নাট্যশাস্ত্র রচনা করলেন । ব্রহ্মা এই নাট্যবেদ দেবগণের মধ্যে প্রয়োগ করতে চাইলে ইন্দ্র জানালেন , দেবগণ এই শাস্ত্র ধারণে , প্রয়োগে ও অনুভবে অক্ষম , মর্তের ঋষিগণই এর যোগ্য পাত্র । ইন্দ্রের পরামর্শে ব্রহ্মা ভরতকে এই নাট্যবেদ প্রদান করেন ও তাকে শতপুত্র এই নাট্যবেদ প্রয়োগের আদেশ দেন । ভরত শতপুত্রকে সুশিক্ষিত করলেন । নাট্যাদিকে ভারতী , সাত্বতী , আরভটী বৃত্তি যোজনা করলেন । পরে ব্রহ্মার নির্দেশে কৈশিকী বৃত্তিও প্রয়োগ করেন । এভাবে নাট্যকলা সম্পূর্ণ শিক্ষিত করে পুত্রগণ , স্বাতি ও নারদসহ ভরত ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়ে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ব্রহ্মা তাঁকে' মহেন্দ্র বিজয়োৎসব' উপলক্ষে নাট্যবেদ প্রয়োগ করার নির্দেশ দিলেন । ভরত তদনুসারে দেবগণ কর্তৃক দৈত্যগণের পরাজয় বিষয়ক নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন । অভিনয় দেখে দেবগণ প্রীত হলেও অসুরগণ অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হল । দৈত্যগণ নাট্যানুষ্ঠানকে ব্যর্থ করার জন্য মায়াবলে নানাপ্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকল । এই অবস্থায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে জর্জর দণ্ড দিয়ে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসুরদের চূর্ণ করে দিলেন ।

এরপর দৈত্যগণ একদিন পিতামহ ব্রহ্মার কাছে এসে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে জানাল - " যেহেতু আপনার থেকেই যেমন দেবগণ তেমনই দৈত্যগণ সকলেই উদ্ভূত হয়েছে , সুতরাং এধরনের কাজ করা আপনার উচিত নয় ! ব্রহ্মা তাদের আশ্বস্ত করে বললেন - এই নাটকে কেবল দৈত্যগণের বা দেবগণেরই রূপারোপ নেই , এই নাটক সমগ্র ত্রিভুবনেরই ভাবের অনুকরণ ; সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অনুকরণ এই নাট্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে । এভাবে দৈত্যগণকে

শান্ত করে ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে স্বর্গে এক নাট্যশালা নির্মাণের আদেশ দিলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং 'অমৃত মন্থন' নামক এক নাটক রচনা করলেন। ভরতের পরিচালনায় এই নাটক স্বর্গের নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হল। সকলেই নাট্যাভিনয়ের প্রশংসা করলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত শিব এই নাট্যাভিনয়ানুষ্ঠান দেখেন নি। ব্রহ্মা শিবকে নাট্যাভিনয় দেখানোর জন্য উৎসুক হলেন। ভরতকে প্রস্তুত হতে আদেশ দিয়ে তিনি আবার নাটক 'ত্রিপুর দাহ' রচনা করলেন। কৈলাসে শিবের সমক্ষে এই নাটকের অভিনয় হল। মহাদেব অভিনয় দেখে সন্তুষ্ট হলেন বটে, কিন্তু নাটকে নৃত্যের অভাব দেখে তিনি বললেন - এই নাট্যাভিনয় (পূর্বরঙ্গ) ভালই হয়েছে, কিন্তু এতে নৃত্য জুড়ে দিলে আরও সুন্দর হবে। তখন ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব তণ্ডু মুনিকে ডেকে বললেন, "তুমি ভরতকে নৃত্যের অঙ্গহারাদি প্রয়োগ শিখিয়ে দাও।"

"প্রয়োগমঙ্গহারাণামাচক্ষ্ব ভরতায় বৈ" । (৪।১৬)

মহাদেবের আদেশে তণ্ডু ভরতকে এই নৃত্য শিক্ষা দিলেন। তণ্ডুর নামানুসারে এই নৃত্যের নাম হল 'তাণ্ডব'।

এই হল ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত নাট্যোৎপত্তির ইতিহাস। ভারতীয় সংস্কার ও মানসিকতার পোষকতা করে সব ঘটনার মতই ভরত নাট্যোৎপত্তির মূলে দৈব প্রভাব বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনা পৌরাণিক মহিমা ও মর্যাদা অর্জন করলেও নাট্যসৃষ্টির প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধান এথেকে পাওয়া যাবে না। আচার্য ভরতের আবির্ভাবকাল স্থিরভূপে নিরূপিত না হলেও তাঁর নাট্যশাস্ত্র যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পূর্ববর্তী নয়, এ সম্বন্ধে সকলেই মোটামুটি একমত।[১] ভরতের আগেও নাটক ছিল। ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকেই যে নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে নানা উল্লেখ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া একথা ও ঠিক যে, আগে ভাষা তারপর যেমন ব্যাকরণ তেমনি আগে নাটক, পরে নাট্যশাস্ত্র। কোন দেশে কোন কালেই আগে শাস্ত্র, পরে সৃষ্টি হয়নি, হওয়া সম্ভবও নয়। সৃষ্টির দৃষ্টান্ত দেখেই শাস্ত্রকার সূত্র সৃষ্টি করেন। সুতরাং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের আগেই ভারতবর্ষে নাটকের অস্তিত্ব কল্পনা যেমন অহেতুক নয়, তেমনি প্রাক-ভারতীয় নাট্যানুসন্ধান এই প্রসঙ্গে অপরিহার্য।

মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের[২] সময়ে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন। তাঁর 'মাল-

বিকাগ্নিমিত্র'র প্রস্তাবনায় তিনি ভাস, ধাবক, সৌমিল্ল, কবিপুত্র প্রমুখ যে কয়জন পূর্বসূরী নাট্যকারের নাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র ভাস ছাড়া আর কারুর একটি নাটকও এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' যে প্রাচীনতম নাটক বলে মনে করা হত, সে ধারণাও পরে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং প্রাপ্ত নিদর্শন অনুসারে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ই ছিল প্রাচীনতম নাট্য-নিদর্শন। ১৯১০ খ্রী° ত্রিবাঙ্কুর থেকে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী যখন ভাসের নামাঙ্কিত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করলেন, তখন পণ্ডিত-মহল সজাগ হয়ে উঠলেন। ভাস কালিদাসের পূর্ববর্তী এবং কবি - নাট্যকার হিসাবেও ছিলেন খ্যাতিমান। ভাস সম্ভবতঃ তৃতীয় শতাব্দীর লোক ছিলেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক লুডার মধ্য - এশিয়ার তুর্ফান থেকে গোটা তিনেক জীর্ণ তালপাতার পুঁথি আবিষ্কার করেন।[৩] দুটির রচয়িতা কে, তা জানার উপায় নেই। একটি অশ্বঘোষ রচিত নাটক 'শারদ্বতীপুত্র বা শারিপুত্র প্রকরণ'। অশ্বঘোষ কনিষ্কের সভাকবি ছিলেন, সুতরাং প্রথম শতাব্দীর লোক। পণ্ডিত মহলে 'শারিপুত্র' নিয়ে একটু মতদ্বৈধ আছে। কারুর মতে অশ্বঘোষ ভরতের পূর্ববর্তী, কারুর মতে ভরত ও অশ্বঘোষ সমসাময়িক। অশ্বঘোষের নাটকে নাট্যশাস্ত্রের নীতি - নির্দেশের যেমন কিছু কিছু অনুসরণ আছে, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, নাটকটি নাট্যশাস্ত্রোক্ত দশ-রূপকের অন্তর্গত নবাঙ্ক বিশিষ্ট একটি প্রকরণ। সংলাপ ও পাত্র - নির্দিষ্ট পন্থায় রচিত। রাজা, রাণী, বুদ্ধ প্রভৃতি চরিত্র সংস্কৃতে - কখনও পদ্যে কথা বলেন। কিন্তু বিদূষক কথা বলে প্রাকৃতে। নাটকে এই বিদূষক চরিত্রের রূপারোপও শাস্ত্রানুসরণের দৃষ্টান্ত বলে গণ্য। যাই হোক, এখনও পর্যন্ত অশ্বঘোষের এই নাটকটিই প্রাপ্ত প্রাচীনতম নাটক। এর আগে কি ছিল, আমরা জানি না। তবে অনুমান করতে পারি, 'শারিপুত্রে'র মত একটি নাটক হঠাৎ রচিত হয় নি, এর পেছনে নাট্যচর্চার একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস নিশ্চয়ই ছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ভাসকে কেউ কেউ[৪] অশ্বঘোষেরও পূর্ববর্তী বলে মনে করেন। এর কারণ প্রধানতঃ দুটি - প্রথমত: ভাসের কোন নাটকেই নাট্যশাস্ত্রের পারিভাষিক বিধি - নিষেধের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় না, পরিভাষা ভাসের নিজস্ব। ভাস সম্ভবতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না এবং তাঁর আবির্ভাবকালও ভরতের পূর্ববর্তী হওয়া অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, ভাস যদি পাণিনির পরে আবির্ভূত হয়ে থাকেন তবে তাঁর

লেখায় এত অপাণিনীয় শব্দ থাকে কি করে ? তাহলে ভাস কি পাণিনিরও পূর্ব-বর্তী ? যাইহোক, ভাস যদি অশ্বঘোষেরও পূর্ববর্তী হন তাহলেও মূল প্রশ্নটি অপরিবর্তিতই থাকে । প্রাক্ - ভাস পর্বের ভারতীয় নাটকের ধারাটি কি , এবং তা কেমন ছিল ? ভাসের সময় এখনও নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নি । তুর্ফানে আবিষ্কৃত তিনটি নাটকই বৌদ্ধ - যুগের , নাটকের বিষয়বস্তুও ছিল বৌদ্ধ-ধর্মাশ্রিত ।

অশ্বঘোষ - ভাসের পূর্ববর্তী কালের নাটক এখনও আবিষ্কৃত হয় নি । তবে অনুমান করা যায় , এই নাট্যচর্চার ধারা আরও কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই চলে এসেছে । কিন্তু যেহেতু তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত নেই , তাই পরোক্ষ-প্রমাণের উপর নির্ভর করেই মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে হয় । এই পরোক্ষ প্রমাণ-গুলির মধ্যে পড়ে বৌদ্ধসাহিত্য , শিলালেখ , সূত্রসাহিত্য , রামায়ণ - মহাভারত , বৈদিক সাহিত্য প্রভৃতি ।

বুদ্ধদেব সম্ভবতঃ পাণিনির সমসাময়িক । তাঁর সময়ে নাটক ছিল কিনা বা থাকলেও তা কেমন ছিল , আমরা তা জানি না । তবে বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের নাট্যাভিনয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন । ভিক্ষুগণের পক্ষে নৃত্য - গীত - বাদিত্র এবং 'পেক্খা' নিষিদ্ধ ছিল । বৌদ্ধ 'সিক্খা' পদগুলির অনুশাসন থেকে অনুমিত হয় , তখন ' পেক্খা ' বা অভিনয় দর্শন ব্যাপারটি খুব জনপ্রিয় ছিল । নতুবা এমন স্পষ্ট করে নিষেধবাক্য উচ্চারণের প্রয়োজন হত না । এই নিষেধের পেছনেও হয়ত একটা কারণ ছিল । নৃত্য - গীত - বাদ্য ও খেলা বোধহয় তখন জনরুচির পোষক হয়ে উঠেছিল । তখনকার দিনে কোন উৎসবে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সামাজিক গণের একত্র সমাবেশকে সমাজ বলা হত । নৃত্য - গীতাদির অনুষ্ঠান এই 'সমাজে'র অঙ্গীভূত ছিল । সুতরাং সংসার - ত্যাগী ধর্মপ্রাণ মুমুক্ষুগণের পক্ষে এই 'সমাজ' একপ্রকার নিষিদ্ধস্থান রূপেই পরিগণিত হয়েছিল । অশোকের গিরনার শিলালিপিতেও এই সমাজ সম্পর্কে নিষেধ বাক্য আছে - (ন চ সমাজো কর্তব্যো)[৫]। কিন্তু পরিশুদ্ধ 'সমাজ' এ তাঁর আপত্তি ছিল না । এই 'সমাজ' শব্দটির মধ্যে যে আনন্দানুষ্ঠানের ইঙ্গিত আছে তার মধ্যে নাট্যানুষ্ঠানই ছিল প্রধান । বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' ও এই সমাজ কথাটি আছে এবং সেই সমাজেরও অপরিহার্য অঙ্গ ছিল 'প্রেক্ষণক' । জাতকের কাহিনীগুলিতেও এই ধরনের সমাজের উল্লেখ আছে । কনবের জাতকে স্পষ্টভাবেই নট, সমাজ এবং সমাজ মণ্ডলীর কথা আছে ।

বুদ্ধদেব নিষেধ করলেও, বৌদ্ধরা এই অভিনয় ব্যাপারটিকে ত্যাগ করতে পারেন নি। বরং তাঁরা বুদ্ধদেবকেই নাট্যশাস্ত্র বিশারদ বানিয়ে তুলেছেন। বুদ্ধদেবের মহাকালে নাগরাজের সম্মানার্থে বিম্বিসার নাটকাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। তৃতীয় শতকের 'অবদান শতকে' র একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে, কুকুন্দনন্দ নামে জনৈক এক বুদ্ধ শোভাবতী নগরীতে নিজেই একটি নাটক অভিনয় করিয়েছিলেন। এই নাট্যসম্প্রদায়ই রাজগৃহে গৌতম বুদ্ধের সম্মুখে একটি নাটক অভিনয় করেছিলেন। বৌদ্ধসাহিত্যের এই কাহিনীগুলি যদি সত্য হয়, তবে একথা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না যে, জনজীবনে নাট্যাভিনয়ের সুতীব্র আকর্ষণ ছিল এবং তদনুসারে ব্যাপক নাট্যচর্চাও হত।

উল্লিখিত বৌদ্ধ-সাহিত্যগুলি ছাড়া নট ও নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ দ্বিতীয় শতকের পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে'। 'মহাভাষ্যের' তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৬ সূত্রটির আলোচনা নাট্যানুসন্ধান উপলক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃত নাটকের উৎসসন্ধানে সকলেই এর দ্বারস্থ হয়েছেন। কেউ কেউ এই ভাষ্য থেকে নিজ নিজ মত অনু-সিদ্ধান্তও করেছেন। পতঞ্জলি এই সূত্রে ক্রিয়াপদে বর্তমান কালের প্রয়োগবিধি নিয়ে সোদাহরণ আলোচনা করেছেন। অতীতের ঘটনায় ও বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় কি ভাবে? তা দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন - এই যেমন, কংসকে বধ করা হচ্ছে, বলিকে বাঁধা হচ্ছে। কংস তো চিরহত (অতীতেই হত হয়েছেন), বলিও চিরবদ্ধ, তা হলে? হয় এভাবে - শৌভিকেরা (অথবা শোভনিক বা শোভিক) প্রত্যক্ষরূপে (চোখের সামনেই) কংসকে হত্যা করছেন, বলিকে বাঁধছেন।[৭] এই শৌভিক কারা? যাঁরা কংস বধ কিংবা বলির বন্ধনকে প্রত্যক্ষ করাচ্ছেন - সুতরাং এঁরা নিশ্চয়ই নট।[৮] এঁরা নাট্যাভিনয়ের দ্বারাই কংসবধ বা বলি বন্ধন ঘটনাকে বাস্তবায়িত করতেন। এই বর্ণনাটি থেকে অবশ্য বোঝা যায় না, নটেরা নাট্যাভিনয়ে সংলাপ ব্যবহার করতেন কিনা। কেউ কেউ অনুমান করেছেন, যেহেতু এখানে সংলাপের কথা নেই, তাই এই নটদের অভিনয় ছিল মূকাভিনয়।[৯] কিন্তু এই অনুমান যে ঠিক নয়, তা বোঝা যায় প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ২৯ সংখ্যক ভাষ্য থেকে। এই সূত্রে উপযোগের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে ভাষ্যকার লিখেছেন - 'নটস্য শৃণোতি' 'গ্রন্থিকস্য শৃণোতি'। ...'আরঙ্গকা রঙ্গং গচ্ছন্তি'। 'নটস্য শ্রোষ্যামঃ',

'গ্রন্থিকস্য শ্রোষ্যামঃ' । এই ভাষ্যে 'নটস্য শ্রোষ্যামঃ' বা 'নটস্য শৃণোতি' কথাগুলির দ্বারা নটেদের সংলাপ 'শ্রবণে'র দ্বারাই ব্যঞ্জিত হয়েছে । সুত - রাং শৌভিক যদি 'নট' হয়, তাহলে নটেরা যে মূকাভিনয় করতেন না, সংলাপই উচ্চারণ করতেন, তা এ থেকে সুস্পষ্ট হয় । তবে এই সংলাপ গদ্যে ছিল কি পদ্যে ছিল, তা অবশ্য এ থেকে বোঝা যায় না । যদিও ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'নট - নাট্য - নাটক' এ বন্ধনীভুক্ত করে 'গান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন । মহাভাষ্যের ৫ । ২ । ২ সূত্রে নটদের আচার - আচরণ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য আছে । তাতে 'অগাসীন্ নটঃ', 'অলাসীদ্ ধনম্' - অর্থাৎ নট গাইল, ধন প্রাপ্ত হল - এই পংক্তিগুলির দ্বারা নটেরা যে গান করে অর্থ উপার্জন করতেন, তার ইঙ্গিত পাই । যদি তাই হয়, তা হলে তখনকার নাটকা- ভিনয়ে সঙ্গীতের প্রাধান্য ছিল বুঝতে হবে । এর থেকে আরও একটি বিষয় অনুমান করা যেতে পারে যে, পতঞ্জলির সময়ে প্রাচীন ধরনের কোন নটসূত্র প্রচলিত থাকলেও ভরত - নাট্যশাস্ত্র ছিল না ।

পতঞ্জলির এই ভাষ্যে আরও দু' ধরনের লোকরঞ্জক শাখার উল্লেখ আছে - এক, চিত্র বা আলেখ্য বা পট দর্শন এবং দুই, গ্রন্থিক বা কথক বা পাঠ শ্রবণ । ভাষ্যকার বলেছেন - ''চিত্রেষ্বপি উদ্‌গূর্ণা নিপতিতাশ্চ প্রহারা দৃশ্যন্তে কংসকর্ষণ্যশ্চ (পা. কংসস্য বাসুদেবস্য চ)'' গ্রন্থিকেষু কথং, যত্র শব্দগুন্ধঃ গড়ুমাত্রং লক্ষ্যতে ।। তেহপি হি তেষামুৎপত্তিপ্রভৃত্যা বিনাশা দৃদ্ধী- র্ব্যাচক্ষাণাঃ সতো বুদ্ধিবিষয়ান্ প্রকাশয়ন্তি ।" ডঃ সুকুমার সেন এর অর্থ করেছেন এভাবে," চিত্রে (অর্থাৎ পুতুলবাজিতে) কেমন ? চিত্রেও দেখা যায় ওঠা, নামা, মারামারি, কংসকে নিয়ে হৈচড়া হৈঁচড়ি । গ্রন্থিকদের (অর্থাৎ গ্রন্থপাঠকদের, কথকদের) বেলায় কেমন ? সেখানে শুধু কথার ছটায় পাওয়া যায় (অর্থাৎ উপলব্ধ হয়) ? সে ব্যাপারেও দেখা যায় যে তাদের (অর্থাৎ - নায়কের) জন্ম থেকে বিনাশ পর্যন্ত ঋদ্ধি ব্যাখ্যা করতে বুদ্ধি বিষয় (অর্থাৎ যা মনে মনে ধারণা করে নিতে হয় সে সব আইডিয়া) প্রকাশ করছে ।" চিত্র

সম্বন্ধে পাদটীকায় তিনি পুনরায় বলেছেন - " চিত্র এখানে আঁকা ছবি নয়, চিত্র শব্দের এখানে ইন্দো - ইরাণীয় অর্থ - প্রতিমূর্তি, প্রতিরূপ। প্রতিমূর্তি অর্থে ছবি শব্দের ব্যবহার এখনো আছে।"[10]

ডঃ সেন' চিত্র' অর্থে প্রতিমূর্তি বা পুতুল বাজি ধরেছেন। মহাভাষ্যের টীকাকার কৈয়ট চিত্র অর্থে ছবি বা আলেখ্যই বুঝেছেন।[11] ইন্দো-ইরাণীয় মূল ধরে চিত্র শব্দের এই ব্যাখ্যার দ্বারা ডঃ সেন নাট্যোৎপত্তির মূলে পুতুলখেলার অস্তিত্বই সন্ধান করতে চেয়েছেন। 'উগ্রং গাঁ নিপতিতাশ্চ' বাক্যাংশটির অর্থে পুতুলবাজির অস্তিত্ব কল্পনা করে তিনি কংসাদি প্রতিমূর্তির 'উঠা, নাপা' করেছেন। অর্থটি মূলের অর্থোপলব্ধির পক্ষে কিছু বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়। পুতুল খেলার প্রচলন ভারতে সুপ্রাচীন, সন্দেহ নেই, কিন্তু আলেখ্য দর্শন ব্যাপারটিও অর্বাচীন নয়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে এই আলেখ্য-দর্শন প্রসঙ্গের কথা ত আমরা সকলেই জানি। লোকরঞ্জক ও জনশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এই পটশিল্প খুবই জনপ্রিয় ছিল। আধুনিক চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রসারের আগে পর্যন্ত এর চাহিদাও ছিল। সুতরাং চিত্র অর্থে পট না ধরে পুতুলবাজি ধরার যুক্তি খুব সঙ্গত নয় বলেই মনে হয়। কথকতাও অপর একটি জনপ্রিয় লোকরঞ্জক শাখা। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এইকথকতা ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ডে প্রচলিত ছিল।

পতঞ্জলি রঙ্গস্থলের বর্ণনায় বলেছেন, - ' ব্যামিশ্রাশ্চ দৃশ্যন্তে।' এই 'বিমিশ্র' ব্যাপারটি কি? এর উত্তর - কেউ বা কংসভক্ত হতেন, কেউ বা বাসুদেব ভক্ত। এঁরা কেউ কালমুখো হতেন, কেউ বা লালমুখো। এই রঙ মাখতো কারা? দর্শকরা, না নটেরা? মুখে রঙ মেখে দর্শক বা শ্রোতারা রঙ্গস্থলে যেত, এটা অবিশ্বাস্য। তাছাড়া দর্শকের মধ্যে কে কার ভক্ত হবে? উপাখ্যানকে অভিব্যঞ্জক করে তোলবার উদ্দেশ্যে নটেরাই সম্ভবতঃ এই রঙ মাখত। কংসানুকারীরা লাল রঙ এবং বাসুদেবানুকারীরা কাল রঙ ব্যবহার করত।

পতঞ্জলির সময়ে নাট্যচর্চা একটি বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় লোক-রঞ্জক শাখা ছিল বলে মনে হয়। তবে নটদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বোধ হয় তেমন ছিল না। পতঞ্জলি নানা প্রসঙ্গে বহুবার নট-দের কথা উল্লেখ করলেও

'নটী'দের কথা বলেন নি । তখন বোধ হয় ছেলেরাই স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করত । ওদের বলা হত - 'ভ্রূকুংস' ।

কৌটিল্য পতঞ্জলির পূর্ববর্তী , খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ব্যক্তি। তাঁর 'অর্থশাস্ত্রে' [১২] নট , নাটক ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায় । ঐ মহাগ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে নট , রঙ্গোপজীবী , কুশীলব , গায়ক , বাদক , নর্তক , বাগজীবন প্রভৃতির কথা আছে । প্রথম অধিকরণের একুশ অধ্যায়ে কুশীলবগণের (রাজসমীপে) নর্মক্রীড়ার বিধিনিষেধ সম্পর্কে বলা হয়েছে , - ''কুশীলবাঃ শস্ত্রাগ্নি রসবর্জং নর্মযুঃ'' - এখানে কুশীলব নটনর্তকাদি সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয় । ২।১ অধ্যায়ে রঙ্গ (নাট) শালার কথা আছে , - (জনপদে) বিহারার্থ উৎসব ও (রঙ্গ - নাট ?) শালা থাকবে না । তাহলে নট , নর্তক , গায়ক , বাদক , বাগ্জীবন (কথাকার , কথক) ও কুশীলবেরা (যারা নানারূপ গীত বাদ্য অভিনয়ের দ্বারা জনমনোরঞ্জন করে অথবা চারণ) জনপদবাসীদের কর্মবিঘ্ন ঘটাতে পারবে না । (" ন চ তত্রারামা বিহারার্থাঃ শালাঃ স্যুঃ নটনর্তকগায়নবাদক বাগ্জীবনকুশীলবা বা ন কর্মবিঘ্নং কুর্যুঃ ।") আবার ২।২৭ অধ্যায়েও কতকগুলি বৃত্তিধারীর নাম আছে - নট , নর্তক , গায়ক , বাদক , বাগ্জীবন , কুশীলব (" নর্তকীদ্বারা নাচগান করাইয়া জীবিকাকারী" - রা.গো. বসাক) , প্লবক (দড়ি দিয়ে যারা খেলা দেখায়) , সৌভিক (- 'ঐন্দ্রজালিক'- রা. বসাক) চারণ ইত্যাদি । এই উল্লেখগুলিতে দেখা যাচ্ছে নট , নর্তক , কুশীলব প্রভৃতি আলাদা আলাদা শ্রেণীর লোক । এই অধ্যায়েই দেখা যায় , আচার্যগণ গণিকা , দাসী ও রঙ্গোপজীবিনীগণকে বিভিন্ন কলাদির সঙ্গে নৃত্য , নাট্যও শিক্ষা দান করতেন । [১৩]

তখনকার দিনে যে রীতিমত নাটকাভিনয় হত এবং স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত অভিনয় ছাড়াও মহিলাদের দ্বারা প্রযুক্ত নাটকাভিনয়ও হ'ত তার ইঙ্গিত আছে ২।৩৬ অধ্যায়ে । এই অধ্যায়েই আরও ইঙ্গিত আছে , এই সব অভিনয় দিনে ও রাত্রে - দু'সময়েই হত । মহিলাদের দ্বারা প্রযুজ্যমান নাটকাদি দর্শনকে বলা

হয়েছে - 'স্ত্রীপেক্ষা'। পুরুষদের দ্বারা প্রযুজ্যমান নাট্যাদি দর্শনকে বলা হয়েছে - 'পুরুষপ্রেক্ষা'।

নাট্যাদির অভিনয় ব্যবস্থা সামাজিক গণের কাছে থেকে চাঁদা (অংশ) তুলেই করা হত। যে চাঁদা দিত না, তাকে অভিনয় দেখতে বা গীত-বাদ্যাদি শুনতে দেওয়া হত না। নাট্যগীতাদিকে সমাজের হিতের অনুষ্ঠান বলা হয়েছে। এই সব অনুষ্ঠানে চাঁদা না দিয়ে যদি কেউ লুকিয়ে নাট-গীতাদি দেখতে বা শুনতে যেত, তবে তাকে দেয় চাঁদার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড দিতে হত।" "প্রেক্ষায়ামনংশদঃ সস্বজনো ন প্রেক্ষেত। প্রচ্ছন্নশ্রবণেক্ষণে চ সর্বহিতে চ কর্মণি নিগ্রহেণ দ্বিগুণমংশং দদ্যাৎ।" (৩।১০)।

'অষ্টাধ্যায়ী'র রচয়িতা পাণিনি সম্ভবতঃ ৫ম - ৬ষ্ঠ খ্রী-পূর্বাব্দের লোক।[১৪] 'নট' শব্দের প্রাচীনতম প্রয়োগ পাওয়া যায় পাণিনিতেই। এর আগের সাহিত্যাদি কোথাও 'নট' শব্দের প্রয়োগ নেই। পাণিনি 'নাট্যম্' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন - 'নটদের ধর্ম' - (নটানাং ধর্ম আম্নায়ো বা)। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে - এই নট কারা? এরা অভিনেতা, না নৃত্যশিল্পী? সন্দেহের কারণ, পাণিনির কাছে নৃত্য ও নাট্যে কোন পার্থক্য ছিল কিনা, কিছুই জানা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় 'নট্' ধাতুটি নেই। 'নৃৎ' ধাতুর অর্থ - নৃত্য করা। সুতরাং 'নৃৎ' ধাতু দ্বারাই 'নট্' ধাতুর অর্থপ্রতিপাদিত হত কিনা, বলা শক্ত। 'নট্' ধাতুটি প্রাকৃত ভাষায় পাওয়া যায়। অধ্যাপক কিপের (Kuiper)বলেছেন, এই ধাতুটি আর্যেতর কোন ভাষা থেকে এসেছে। অধ্যাপক কিপেরের অনুমানটি সম্ভবতঃ অযুক্ত নয়। এ সম্পর্কে আমরা পরে চিন্তা করব। আপাততঃ এটুকুই বলা যায়, 'নর্তক' ও 'নট' - এক কথা নয়। 'নৃৎ' ধাতু থেকে 'নর্তক', 'নৃত্য', 'নৃত্যতি' ইত্যাদি শব্দগুলি নিষ্পন্ন হলেও 'নট্' থেকে তা হয় না। 'নট্', 'নাট', 'নাট্য', 'নটতি' ইত্যাদি শব্দগুলি 'নট্' ধাতুজাত। 'নৃৎ' ধাতু দ্বারা যেমন 'নৃত্য' বা নাচ বুঝায়, তেমনি 'নট্' ধাতু দ্বারা বুঝানো হয় অভিনয়। মনে হয়, আর্যেতর ভাষা থেকে অভিনয় অর্থ প্রতিপাদক 'নট' শব্দটি পাণিনির পূর্বেই

আর্য-ভাষায় পরিগৃহীত হয়েছিল এবং পাণিনিও অভিনয় ও অভিনেতা অর্থেই 'নট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ।

তাহলে নটসূত্রগুলি কি ? শৈলাল ও কৃশাশ্ব দু'টি নাটসূত্র কি দু'ধরনের নাট্যরীতির সূত্রগ্রন্থ ? 'নটসূত্র' বলতে 'নটকর্মের বিধিবিধান' বা 'আদিম নাট্যশাস্ত্র' অর্থ বুঝে নিয়েছেন প্রায় সকলেই ।[১৫] তবে এই নটসূত্রগুলি সম্ভবতঃ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি । পতঞ্জলির অনেক আগেই সম্ভবতঃ এই নটসূত্রগুলি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । তা না হলে তিনি তাঁর 'মহাভাষ্যে' 'কথং শৈলালিনো নটাঃ' - এই প্রশ্ন তুলতেন না ।

পাণিনির আগেও 'নট' অর্থে 'শৈলূষ' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় । শুক্ল যজুর্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতায় এই শব্দটি আছে । এই সংহিতার টীকাকার মহীধর বলেছেন - 'শৈলূষবনেটযু '- শৈলূষই নট । রামায়ণ-মহাভারতেও 'শৈলূষ' শব্দের প্রয়োগ আছে ।

রামায়ণের কাল নিয়েও একটা সংশয় আছে । রামায়ণ-মহাভারতে নৃত্য-গীতাদি - অভিনয়ের উল্লেখ আছে । রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে (৬৫ । ১৫) বর্ণিত বক্তব্যটি যদি প্রক্ষিপ্ত না হয় , তবে ঐ কালে নাটক ও অভিনয়ের যে বেশ সমাদর ছিল , তা বেশ বুঝা যায় । শ্লোকটি হল -

" নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্তকাঃ ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ধন্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ ।।"

অর্থাৎ অরাজক জনপদে নটেরা ও নর্তকেরা প্রহৃষ্ট হয় না । উৎসবাদি ও সমাজ রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধির কারক । এখানে নাট্যাভিনয়ও যে রাষ্ট্রবর্ধক তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ।

প্রাচীন ভারতে নাটকের সন্ধানে সংস্কৃত সাহিত্যের ধারাপথ বেয়ে পাণিনি পর্যন্ত পৌঁছুনো যায় । এর আগে আর 'নট' ধাতুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না । যা পাওয়া যায় , সবই 'নৃৎ' আর ' গৈ' ধাতুর ব্যাপার - নাচ আর গান । বৈদিক সাহিত্যে নৃত্য - গীতের যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু

নাট্যাভিনয়ের কথা কোথাও নেই। বৈদিক যুগে নৃত্য-গীতাদির খুব সমাদর ছিল, ব্যাপক চর্চাও হত। উৎসবে-ব্যসনে সর্বত্রই নাচ ও গানের রেওয়াজ ছিল। পুরুষরা ও স্ত্রীরা মধ্যে মধ্যে দাস-দাসীরাও নৃত্য-গীতের কিছুটা তালিম নিত বোধ হয়। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের ৭ম কাণ্ডের যে প্রপাঠকের ১০ অনুবাকে একটি দাসীনৃত্যের বর্ণনা আছে। এই অনুবাকে আছে-"জলপূর্ণ কলসী নিয়ে দাসীগণ নৃত্য করতে করতে গান করে। ..... দাসীরা কলসী মাথায় নিয়ে যজ্ঞভূমির চারদিক ঘিরে নাচে আর নাচের তালে তালে ডান পা দিয়ে আঘাত করে। অথর্ববেদের একটি অনুবাকে নৃত্য-গীতের উল্লেখ আছে-"যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ" (১২।১।৪১)।

বেদের একটা অংশের নাম সামবেদ। এই সামবেদকেই ভারতীয় সঙ্গীতের আদিগ্রন্থ বলা যায়। যজ্ঞকালে উদ্গাতাগণ যে সব 'ঋক্মন্ত্রগুলি' সুরে বেঁধে গাইতেন, সেগুলি নিয়েই গ্রথিত হয়েছিল সামবেদ। বৈদিক আচারে যজ্ঞ ছিল একটি অত্যাবশ্যক কৃত্য এবং সামগান ছিল এই যজ্ঞের অপরিহার্য অঙ্গ। এর সঙ্গে যুক্ত হত নৃত্য। 'মহাব্রতে' খুব নাচ-গান হত। এতে তরুণ-তরুণীরা তাতেও যোগ দিত পুত্রবতী অথবা পুংশ্চলীগণ। মহাব্রতের একটা অনুষ্ঠান খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ঐ যজ্ঞে সোম ক্রয় বিক্রয়ের ঘটনা নিয়ে একটা মূল্য কলহের অভিনয় হত। সোমবিক্রেতাকে শেষপর্যন্ত প্রহার করে তাড়িয়ে দেওয়া হত। আবার একখণ্ড চামড়ার অধিকার নিয়ে এক শূদ্র ও বৈশ্যের মধ্যে বিবাদের অভিনয়ও হত। এতে শেষপর্যন্ত বৈশ্যের কাছে শূদ্রের পরাজয় ঘটানো হত। জনৈক ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক বারাঙ্গনার গালিগালাজ পূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তির অভিনয়ের মধ্যে অনেকে উৎপাদিকা শক্তির তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন[১৬] এটি যে প্রচুর পরিমাণে জনরুচির খোরাক জোগাত, তা সহজেই অনুমেয়। মহাব্রতে এই সব অভিনয়-ব্যাপার লক্ষ্য করার মত। এই অভিনয়গুলির ধর্মীয় তাৎপর্য কিছু ছিল কিনা আমরা জানি না। যজ্ঞানুষ্ঠানে এ জাতীয় অভিনয়েরই বা প্রয়োজন কি? তবে জনমনোরঞ্জনের একটা ব্যাপার যে এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল তাতে সন্দেহ নেই।[১৭]

মহাযুগের মত এমন অভিনয় হত কিনা আমরা জানি না , কিন্তু নাট্যলক্ষণ যুক্ত অনেকগুলি কথোপকথন যুক্ত সূক্তের সন্ধান পাওয়া যায় ঋগ্বেদ সংহিতায় । ঋগ্বেদের সংবাদ সূক্তগুলিপ্রতি সর্বপ্রথম স্কলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ম্যাক্স মুলার । এর পর দেশী - বিদেশী বহু পণ্ডিত এই সংবাদ সূক্তগুলির নাট্য - সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন । কিন্তু কেউই তেমন কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি । এই সূক্তগুলির মধ্যে একোক্তি জাতীয় সূক্ত যেমন আছে , তেমনি দু জন এবং বহুজনের কথোপকথন যুক্ত সূক্তও আছে । এরূপ সূক্তঋগ্বেদে আছে অনেক-গুলি । কমপক্ষে অন্ততঃ গোটা কুড়ি সূক্ত ও একেবারে নির্দোষ নাটিকাংশ । এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল -

১: ১৬৫ - এই সূক্তে ইন্দ্র, মরুৎগণ ও অগস্ত্যের কথোপকথন । মরুৎগণের ও ইন্দ্রের যুদ্ধকর্মের পর্যালোচনা ও প্রশস্তিই এই সূক্তের মুখ্য বর্ণনীয় । এই সূক্তের প্রথম দু টি শ্লোক উক্তবাক্যের মত ।

১: ১৭৯ - এই সূক্তটি কোন দেবতার উদ্দেশে রচিত নয় । অগস্ত্য , তাঁর স্ত্রী ও এক শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন । কথোপকথনের বিষয় - অগস্ত্যের কাছে লোপামুদ্রার রতিপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কিন্তু অগস্ত্য তাঁকে অপর কোন সমর্থ পুরুষের সঙ্গে সঙ্গত হতে পরামর্শ দিচ্ছেন ।

৩: ৩৩ - বিশ্বামিত্র ও নদীদ্বয় এবং বিপাশা ও শুতুদ্রীর মধ্যে কথোপকথন । বিশ্বামিত্র এই নদীদ্বয়কে অতিক্রম করতে চান , তাই এদের সাহায্য প্রার্থী ।

৪: ১৮ - ইন্দ্র , অদিতি এবং বামদেবের মধ্যে কথোপকথন । বামদেব স্বাভাবিক পথে ভূমিষ্ঠ না হয়ে , মায়ের পার্শ্বদেশ ভেদ করে উৎপন্ন হবেন এই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের নিষেধ বাক্য ও তিনজনের কথাবার্তা ।

১০: ১০ - বিখ্যাত যম - যমী সংবাদ । যম ভগ্নী যমী যমের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী কিন্তু যম এমন পাপকর্মে অনিচ্ছুক ।

১০: ২৭ । ২৮ - ইন্দ্র ও বসুক্রের মধ্যে কথোপকথন । ২৮ সূক্তের প্রথমে বসুক্রের স্ত্রীর একটি উক্তি আছে । ১০:২৮ সূক্তটি ডঃ সুকুমার সেন খুব সুন্দর ভাবে নাট্য সংলাপের আকারে সাজিয়ে দেখিয়েছেন তাঁর 'নট-নাট্য-নাটক' গ্রন্থে ।

১০:৩৪ - দ্যূতাসক্ত এক ব্যক্তির খেদোক্তি । সূক্তটি আধুনিক রীতির স্বগতোক্তির অনুরূপ । সংস্কৃতে যাকে একোক্তি বলে, যা 'ভাণ' জাতীয় নাট্যের বৈশিষ্ট্য, এই সূক্ত তারই অনুরূপ ।

১০ : ৮৬ - এটিও একটি কথোপকথন মূলক সূক্ত । ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী ও বৃষাকপির মধ্যে কথাবার্তা ।

১০ : ৯৫ - ১০:১০ এর মত এটিও একটি বিখ্যাত সূক্ত । উর্বশী ও পুরূরবার মধ্যে কথোপকথন ।

১০ : ১০৮ - পণি ও সরমা সংবাদ ।

১০ : ১৩৫ - যম ও কুমারের কথোপকথন । কঠোপনিষদের যম ও নচিকেতা সংবাদের প্রাক্-রূপ ।

উল্লিখিত সূক্তগুলি ছাড়াও ঋগ্বেদে আরও সূক্ত আছে, যাতে কমবেশি নাট্যগুণ পরিস্ফুট । উল্লিখিত সূক্তগুলির সবক'টির নাট্যরূপ এখানে দেখানোর প্রয়োজন নেই । দৃষ্টান্ত হিসেবে দু'একটি সূক্তের নাট্যরূপ দেখানো যেতে পারে । দশম মন্ডলের ৯৫ সংখ্যক সূক্তটি উর্বশী ও পুরূরবার । কথোপকথন চলছে এভাবে - (সূক্তগুলির নাট্যাদর্শ রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ অনুসরণে করা হল)

সময় - ঊষাকাল

পুরুরবা ।। হায় , উর্বশী ! পত্নী আমার ! অত তাড়াতাড়ি চলে যেও না, তোমার - আমার মধ্যে কিছু কথাবার্তা হওয়া প্রয়োজন । এখন যদি আমরা দুজনে মনের কথা খুলে না বলি , তাহলে ভবিষ্যতে তা সুখের হবে না ।

উর্বশী ।। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে কি হবে ? আমিও প্রথম ঊষার মত চলে এসেছি । তুমি ঘরে ফিরে যাও । বাতাসকে যেমন ধরে রাখা যায় না , আমাকেও তেমনি তুমি ধরে রাখতে পারবে না ।

পুরুরবা ।। উর্বশী ! তোমার বিরহে আমি কাতর হয়ে পড়েছি । দেখ , আমার তূণীর থেকে একটা বাণও বের হয়নি , জয়শ্রীও লাভ হয়নি , যুদ্ধে গিয়ে শত শত গাভীও আনতে পারি নি । আমার রাজকার্য হীনবল হয়েছে । এর কোন শোভা নেই , সৈন্যরাও সিংহনাদ করার চিন্তা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে । (অন্তরীক্ষে ঊষার প্রতি) হে ঊষাদেবি ! সে উর্বশী যদি (কখনও) শ্বশুরকে ভোজন সামগ্রী দিতে ইচ্ছা করতেন , তাহলে নিকটবর্তী গৃহ থেকে শয়ন কক্ষে যেতেন আর সেখানে স্বামীর কাছে দিবারাত্র রতিসুখ উপভোগ করতেন ।

উর্বশী ।। পুরুরবা ! তুমি ও আমাকে প্রতিদিন তিনবার আলিঙ্গন করতে । কোন সতীনের জন্যই আমার কোন ঝগড়া - বিবাদ ছিল না। আমাকেই তুমি সর্বদা তুষ্ট করতে । তোমার ঘরে আমি এলাম, তুমি আমার অনেক সুখের বিধাতা হলে ।

পুরুরবা ।। সুজূর্ণি , শ্রেণি , সুম্ন , আপি , হ্রদচক্ষু , গ্রন্থিনী , চরণ্যু প্রভৃতি আমার যে কজন স্ত্রী ছিল , তুমি আসবার পর তারা আমার কাছে সাজ-সজ্জা করে আসত না । গাভী ঘরে ফেরার সময় যেমন শব্দ করে , তারা আর তেমন শব্দ করে আমার ঘরে আসত না ।

উর্বশী ॥ (স্বগত) পুরুরবা যখন জন্ম গ্রহণ করলেন, তখন দেবাঙ্গনারা তাঁকে দেখতে এল, এখন মনে হয়ে চলে যে নদীরা, তারাও পর্যন্ত তাঁকে সম্বর্ধনা জানাল। (পুরুরবার প্রতি) পুরুরবা! দস্যুবধ উপলক্ষে তুমুল যুদ্ধে পাঠাবার জন্য দেবতারাও তোমাকে কত সম্বর্ধনা জানাতে লাগল।

পুরুরবা ॥ আহ, পুরুরবা নিজে মানুষ হয়ে যখন অপ্সরাদের দিকে এগিয়ে গেল, তখন তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। যেমন, ভয় পেয়ে হরিণী পালিয়ে যায় অথবা রথে যোতা ঘোড়া যেমন ছুটে চলে, তারাও তেমনি চলে গেল।

উর্বশী ॥ পুরুরবা মানুষ হয়ে দেবলোকবাসিনী অপ্সরাদের মধ্যে যখন কথা বলতে, তাদের শরীর স্পর্শ করতে এগিয়ে গেলেন, তখন তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। নিজেদের শরীর দেখাল না; ক্রীড়ামত্ত ঘোড়ার (ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার) মত পালিয়ে গেল।

পুরুরবা ॥ যে উর্বশী আকাশ থেকে পতনশীল বিদ্যুতেরমত ঔজ্জ্বল্য ধারণ করেছিলেন, আমার সব মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন, তাঁর গর্ভে মানুষের ঔরসে সুশ্রী পুত্রের জন্ম হল, সেই উর্বশী তাকে দীর্ঘায়ু করুন।

উর্বশী ॥ পুরুরবা! পৃথিবী পালনের জন্যই তুমি আমার গর্ভে বীর্যপাত করে তোমার পুত্রের জন্মদান করলে। আমি ও তোমাকে সব সময় বলেছি, কি হলে আমি আর তোমার কাছে থাকব না। তুমি তা শুনলে না। এখন পৃথিবী পালনের কাজ ছেড়ে কেন মিছে কথা বাড়াচ্ছ?

পুরুরবা ॥ তোমার ছেলে কবে আমাকে ভালবাসবে? আর যদি আমার কাছে সে আসে, তাহলে কি সে (তোমার জন্য) কাঁদবে না? চোখের জল ফেলবে না? পারস্পরিক প্রীতি-যুক্ত স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটাতে কার ইচ্ছা হয়? তোমার শ্বশুর বাড়িতে (তোমার বিরহে) যে আগুন জ্বলে উঠল।

NORTH BENGAL
University Library
Raja Rammohunpur
114313
21 JAN 1997

উর্বশী ॥ শোন, আমি তোমার কথার উত্তরে বলছি। ছেলে তোমার কাছে গিয়ে কাঁদবে না, চোখের জল ফেলবে না। আমি তার মঙ্গল চিন্তা করব। আমার গর্ভে তুমি যে ছেলের জন্ম দিয়েছ, তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। নির্বোধ তুমি। বাড়ী ফিরে যাও, আমাকে তুমি আর পাবে না।

পুরুরবা ॥ তবে তোমার প্রণয়ীর (অর্থাৎ আমার) আজ মৃত্যু হোক, আর যেন উঠতে না হয়। সে বহু দূরে চলে যাক। সে নিঃঋতির কোলে শুয়ে থাক, নেকড়ে বাঘেরা তাকে ছিঁড়ে খাক।

উর্বশী ॥ পুরুরবা! এমন ভাবে মৃত্যু কামনা কর না। একেবারে উচ্ছন্নে যেও না। দুর্দান্ত নেকড়েরা যেন তোমাকে ভক্ষণ না করে। স্ত্রীলোকের ভালবাসা স্থায়ী হয় না, স্ত্রীলোকের হৃদয় আর নেকড়ে বাঘের হৃদয় দুই একরকম। আমি আমার রূপ পরিবর্তন করে চার বছর মানুষের সঙ্গে বসবাস (রাত্রিবাস) করেছি। আমি দিনের মধ্যে একবার মাত্র একটুখানি ঘী খেতাম, তাই খেয়েই আমি এতদিন ছিলাম।

পুরুরবা ॥ আমি বশিষ্ঠ অন্তরীক্ষ পূর্ণকারিণী আকাশপ্রিয়া উর্বশীকে আলিঙ্গন করছি। তোমার সুকার্যের ফল যেন তোমাতে বর্তায়। উর্বশী! ফিরে এস, আমার হৃদয় (তোমার বিরহে) জ্বলে যাচ্ছে।

উর্বশী ॥ হে ইলাপুত্র পুরুরবা! (শোন) এই দেবতাগণ তোমাকে বলছেন, তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী হবে। নিজের যজ্ঞদ্রব্য দিয়ে দেবতাদের পূজা করবে, তুমি স্বর্গে গিয়ে আমোদ - আহ্লাদ করবে।

এবার দশম মণ্ডলের ৩৪ সংখ্যক সূক্তটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সূক্তটির মধ্যে আধুনিক রীতির *monologue*-এর একটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যাবে। এই সূক্তটির একটি শিরোনামও দেওয়া যেতে পারে, যেমন -

" দ্যুতাসক্তের আত্মবিলাপ "

"বড় বড় পাশাগুলি যখন ছকের উপর এদিক-ওদিক চালানো হয়, দেখে আমার বড়ই আনন্দ হয়। মুজবান পর্বতের সোমলতার রস খেতে যেমন মজা লাগে, বিভীতক গাছের তৈরী পাশাও তেমনি মজার, তেমনি আমায় টানে। (কিছুক্ষণ নীরবতার পর) আমার এমন সুশ্রী স্ত্রী, যে আমার প্রতি কখনও বিরাগ প্রদর্শন করে নি, কখনও আমার কাছে লজ্জিত হয় নি, যে স্ত্রী আমার ও আমার বন্ধুবান্ধবদের এত সেবা শুশ্রূষা করত, আমি এই পাশার জন্যই পরম অনুরাগিণী স্ত্রীকে ত্যাগ করলাম। (রোদন ?) যে লোক পাশা খেলে, তার শ্বশুর তার উপর বিরক্ত হয়, স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে। সে যদি কারুর কাছে কিছু চায়, কেউ তাকে কিছু দেয় না। যেমন বুড়ো ঘোড়াকে কেউ পয়সা দিয়ে কেনে না, পাশাড়ুরাও তেমনি কারুর কাছে সমাদর পায় না। (হায়) পাশার কি বিষম টান, যদি কারুর ধনের উপর পাশার নজর পড়ে, তবে তার স্ত্রীকে অন্যলোকে ভোগ করে (- অর্থাৎ তার স্ত্রী ব্যভিচারিণী হয়)। তার বাবা মা ভাইয়েরা সবাই তাকে এড়িয়ে চলে, (কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে) আমরা ওকে চিনি না, ওকে বেঁধে নিয়ে যাও।

যখন মনে মনে ভাবি, পাশা আর খেলব না, সঙ্গীদের দেখলে যখন সরে যেতে চাই, তখন পাশার উপর রঙিন ঘুঁটিগুলি দেখে আর স্থির থাকতে পারি না। চরিত্রহীনা নারী যেমন উপপতির কাছে যায়, আমিও তেমনি খেলার সঙ্গী-সাথীর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হই। জুয়াড়ি 'আমি জিতব', এই ভাবতে ভাবতে বুক ফুলিয়ে জুয়ার আড্ডায় আসে। পাশার ঘুঁটিগুলি কখনও তার আশা পূরণ করে। প্রতিপক্ষের হার আশা করলে কখনও [illegible] কখনও তা সত্যি হয়ে যায়। এই পাশার জ্বালা কি ভয়ানক। কখনও সে অঙ্কুশের মত খোঁচায়, কখনও ছুরি দিয়ে কাটতে থাকে, কখনও বা গরম লোহার মত ছ্যাঁকা দিতে থাকে, কখনও যেন বাণ দিয়ে বিদ্ধ করতে থাকে।

যখন জিত হয়, তখন কি আনন্দ। মনে হয় যেন নতুন ছেলের বাপ হলাম। সব কিছুই মধুর মনে হয়, সব কথাই কি মিষ্টি লাগে। কিন্তু যখন হার হয়, তখন যেন মরণ-যন্ত্রণা হতে থাকে। সূর্য যেমন করে বিশ্ব-ভুবন ঘুরে বেড়ান, ঠিক তেমনি করে পাশার ঐ তিপ্পান্নটা ঘুঁটি ছকের

উপর ঘুরে বেড়ায় । যে যতবড় শক্তিমানই হোক না কেন , এরা কাউকে তোয়াক্কা করে না । রাজারাও এদের নমস্কার করে চলেন । এরা কখনও উপরে উঠছে , কখনও নিচে নামছে । এদের হাত নেই কিন্তু যাদের হাত আছে তারাও এদের কাছে হার স্বীকার করে । এরা দেখতে সুন্দর , জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ছকের উপর বসে আছে । এদের স্পর্শ শীতল , কিন্তু হৃদয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে ।

যে জুয়ো খেলে , তার স্ত্রীর দুর্গতির সীমা নেই । সে দীনহীনবেশে (ঘর) ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় । ছেলে কোথায় কোথায় ঘুরছে , ভেবে ভেবে মা দিশেহারা । যদি কোন লোক জুয়াড়িকে টাকা ধার দেয় , তবে সে তা ফিরে পাবে কি না , এই ভেবে শংকিত হয় । (পাওনাদারের ভয়ে) জুয়াড়িকে পরের বাড়িতে রাত কাটাতে হয় । নিজের স্ত্রীর দশা দেখে জুয়াড়ির বুক ফেটে যায় । অন্যলোকের স্ত্রীর সৌভাগ্য দেখে , তাদের সুন্দর ঘর-বাড়ি দেখে তার অনুশোচনা হয় । জুয়াড়ি হয়ত সকাল বেলা সুন্দর ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু সন্ধ্যায় তাকে অতি নীচলোকদের সঙ্গে মিশে আগুন পোয়াতে দেখা যায় ।

হে পাশাগণ ! তোমাদের দলের মধ্যে যে প্রধান ও সেনাপতি এবং রাজার মত , আমি আমার এই দশ আঙুল একত্র করে তাকে প্রণাম করছি । আমি সত্য করে বলছি , আমি (আর) টাকা-কড়ি কিছু চাই না । তোমরা যারা পাশা খেল , তোমাদের বলছি , আর কখনও পাশা খেল না । বরং চাষবাস কর । তাতে যা লাভ হবে , তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হও । তাতেই নিজেকে কৃতার্থ বোধ ক'র । এতেই তুমি তোমার স্ত্রীকে পাবে (- অর্থাৎ স্ত্রীর ভালবাসা পাবে) । তোমার অনেক গাভী হবে । প্রভু সূর্যদেব এ কথা আমাকে বলেছেন । পাশাগণ ! আমাদের মঙ্গল কর , আমাদের উপর বন্ধুভাব ধারণ কর । আমাদের উপর থেকে তোমাদের দুর্ধর্ষ প্রভাব দূর কর । আমাদের শত্রুরাই যেন তোমাদের কোপদৃষ্টি পড়ে , তারাই তোমাদের ব্যবহার করতে থাকুক ।"

এই দৃশ্যটির মধ্যে যে নাটকীয়তা আছে, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। উপযুক্ত মঞ্চ নির্দেশ ও অভিনয় নির্দেশ সহ (দু এক ক্ষেত্রে তা এখানে দেখানো হয়েছে) প্রয়োগ করতে পারলে এটি সংক্ষিপ্ত একোক্তি মূলক ভাণ এর রূপ ধারণ করবে। ডঃ সুকুমার সেন এই দৃশ্যটিকে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে একটি সূত্রধার চরিত্র সংযোজন করেছেন। মনে হয়, সূত্রধার চরিত্রটি এখানে অনাবশ্যক। সমস্ত অংশটিরই বক্তা দ্যুতকার। দ্যুতাসক্ত ব্যক্তিটির বিলাপের সঙ্গে অনেকাংশে মিল আছে এমন একটি আধুনিক নাটকের স্বগতোক্তির উল্লেখ এখানে বোধ করি একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের নিমচাঁদের খেদোক্তিটি লক্ষ্য করা যাক, —

নিম : " মহাদেব! বোম্ ভোলানাথ! নিস্তার কর মা, তোমার গণেশের মুণ্ড শনির দৃষ্টিতে উড়ে গেল বাপ — (চিৎ হইয়া পতন) রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্মজ্ঞানমর্যাদাপরিশূন্যী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ! তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয়, তা গিয়েছ।

"Things at the worst will cease,
Or else climb upward
To what they were before — "

হা জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করেছি, আমাকে অন্ধকার মদিরাহ্রদে নিপাতিত কল্লে? যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহার আহরণ করেছেন, সে পিতা এখন আমায় দেখলে চক্ষু মুদিত করেন, যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন, সেই জননী এখন আমায় দেখলে আপনাকে হতভাগিনী

বলে কপালে করাঘাত করেন, যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে বসেন, শাশুড়ী আমায় দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন, শালী-শালাজ আমায় দেখলে হাসেন, _ দাঁতে মিশি মধুর হাসি। তুমি কে, চাও কি, কাঁদো কেন? - আমি সকলের চুলচ্ছিদ, আমি অকন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই, কিন্তু সুধাংশু বদনী আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্য প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুনতে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। আহা! আমার নেশা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি করছে, কুরঙ্গনয়নী কর্ণান্তর ব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজনস্থানে করকপোল হয়ে ভাবনা-প্রবাহে ভাসমানা আছেন, আলুলায়িত কেশ, লুণ্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তের পাশে মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে, কেহ আসছে কি না, একবার মুখ ফিরিয়ে দেখছেন। - মদ কি ছাড়বো! আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সে কালে ভূতে পেতো, এখন মদে পায় - ডাক ওঝা, ডাক ওঝা, ঝাড়ায়ে আমার মদ ছাড়িয়ে দিক - আমি সুরধুনী সভায় নাম লেখাব, কারো কথা শুনবো না, সভাপতি খুড়ো মদের পয়গম্বরা, পয়গম্বরা ভূত ছাড়াতে পারে, সভাপতি খুড়ো মদ ছাড়াতে পারে - বাবা, ভূতের ওঝা আপনি মদ খেয়ে বলে ভূতে মদ খেয়ে গিয়েছে, দেখো বাবা, তুমি আপনি খেয়ে যেন আমাদের দোষ দিও না। এত কালের পর সভায় নাম লেখাব? গোকুল বাবু হবো? ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, জোচ্চোর, নির্দয়, যেদিন দরোয়ান দিয়ে আমাকে বাড়ী হতে বার করে দিয়েছে - (গাত্রোত্থান করিয়া মেজের উপর মুষ্ট্যাঘাত) এর পরিশোধ দেবো, তবে ছাড়বো - তোমার সদর দরজা বন্ধ থাকবে, তোমার অন্দরে ঢুকবো - শালা মাগমুখো। বাস্তবিক কলেজের নাম ডুবুলে, মদ খেতে চায় না - ওঁরা আমার আস্তাবলের বাঁদর, জেঠদের মাথায় ঝাঁটা ভেবে এ মত্ত কচ্চি। বজ্জাত ব্যাটা

অন্ধ হয়েছে, এখন গোহলো ব্যাটাকে অন্ধ করবের উপায় কি ? মল্লযুদ্ধ করবো, কি বলো ? - বটে ৩ ''।

উদ্ধৃত সংলাপ দুটি পাশাপাশি মিলিয়ে দেখলে ঋগ্বেদের সূক্তটির নাট্যসম্ভাবনা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। এ ছাড়া অন্যান্য কথোপকথন মূলক সংবাদ সূক্তগুলিও যথেষ্ট নাট্যসম্ভাবনাময়। এই কারণেই ডঃ সুকুমার সেন এজাতীয় সূক্তগুলিকে বলেছেন 'কথাস্বাদ্যনাট্য' বা 'নাট্যকাব্য কণিকা'।[১৮] পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এগুলির মধ্যে সংস্কৃত নাটকের আদিম রূপ দেখেছেন। ঋগ্বেদের এই সংবাদ সূক্তগুলি পণ্ডিতগণকে ভাবিয়েছে অনেক। সূক্তগুলির উপযোগিতা সেকালের দিনে কি ছিল ? সূক্তগুলি যে কোন যজ্ঞ কর্মে মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হত, তা ভাবা শক্ত। আর যদিই বা ব্যবহার হত, তবে কি ভাবে ? ম্যাক্সমুলার, লেভি প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে এই সূক্তগুলি অভিনীতই হত। পুরোহিতগণ দু দলে বিভক্ত হয়ে এগুলি অভিনয় করতেন। অথবা, এমন ও অনুমান করা যায় যে, সূক্তগুলি একই ব্যক্তি আবৃত্তি করতেন। বিভিন্ন ভঙ্গীর আবৃত্তির দ্বারা তাঁরা চরিত্রবৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়ে তুলতেন। - এ সবই অনুমান - কল্পনা মাত্র। বৈদিক যুগের ঋষিরা আদৌ অভিনয় বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা, তার কোন স্পষ্ট প্রমাণ যেহেতু নেই, তখন এই কল্পনাচারিতা ছাড়া আর পথই বা কি ? তবে একথা ঠিক, বৈদিক যুগের মানুষ নৃত্যগীত অনুরাগী ছিলেন, নানাসূত্র থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং নাচতে যাঁরা জানতেন, অভিনয় রীতিটা যে তাঁদের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল, তা বোধ হয় নয়। তাছাড়া অশ্বমেধ যজ্ঞে ও মহাব্রতের যে অভিনয়গুলির কথা আমরা জানি, ঋগ্বেদের এই সূক্তগুলিকেও তাদেরই সগোত্র বিবেচনা করা সম্ভবতঃ অযৌক্তিক হবে না। আধুনিক কালে এই সংবাদ সূক্তগুলির কোন কোনটিতে ধর্মীয় তাৎপর্য, বিশেষ করে উর্বরা শক্তির অনুষঙ্গ অন্বেষণের চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সবগুলির মূলেই যে এমন ধর্মীয় তাৎপর্য পাওয়া গিয়েছে, তা নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'দ্যূতামত্তের আত্মবিলাপ' সূক্তটির (১০ : ৩৪) কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে।

এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, ঐ সংবাদ-সূক্তগুলি যজ্ঞানুষ্ঠানের দীর্ঘ বিরতি কালে উপস্থিত ভক্ত-দর্শকদের মনোরঞ্জন ও প্রমোদ বিনোদনের উদ্দেশ্যে অভিনয়ে নিবেদিত হত। ঋষিরাই কি এগুলি অভিনয় করতেন অথবা এগুলির রূপারোপের জন্য পুরোহিত ভিন্ন অন্য কোন অভিনেতা - অভিনেত্রী নিযুক্ত হতেন - তা আমাদের জানা নেই। তবে, যে সমাজের লোক নৃত্য-গীতে অনুরাগী ছিলেন, সুদৃশ্য পোশাক-আশাকের সমঝদার ছিলেন, সেই সমাজের লোক যে গেরুয়া-পরা পুরোহিতদের আবৃত্তি শুনেই সন্তুষ্ট হত, তা মনে হয় না। অশ্বমেধ ও মহাব্রত যজ্ঞের কথা স্মরণ করলে ঐ অনুমান যথার্থই মনে হয়।

বৈদিক যুগের ঐ 'কথা-নাট্যকাব্য'গুলি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বৈদিক যুগে কি নাটক-জাতীয় কিছু ছিল? যদি না থাকে, তা হলে এমন নাট্যগুণান্বিত ঐ সূক্তগুলি রচিত হল কি করে? আবার যদি নাটক বা অভিনয় থেকে থাকে, তাহলে ভাস - অশ্বঘোষের আগে কোন নাটক নেই কেন? পতঞ্জলি খ্রীস্ট পূর্ব ২য় শতকের লোক। তিনিও কোন নাটকের কথা উল্লেখ করেন নি, কোন নাট্যশাস্ত্রের অস্তিত্বের কথাও স্বীকার করেন নি। এসব জিজ্ঞাসার উত্তরে যা বলা সম্ভব তা হল, অশ্বঘোষ বা ভাস - এঁদের আগে যে নাটক ছিলই না, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। হার্টেল উত্তর - বৈদিক কালের রচনা 'সুপর্ণাধ্যায়' - এ গ্রথিত কদ্রু-বিনতা প্রভৃতি আখ্যানের মধ্যে বৈদিক সংবাদ সূক্ত এবং সংস্কৃত নাটকের মধ্যবর্তী একটি সংযোজক সূত্রের সন্ধান করেছেন। তাঁর এই অভিমত পণ্ডিতগণ বিবেচনা করে দেখেছেন। 'সুপর্ণাধ্যায়' রচনাটিতে তাঁরা কালানৌচিত্য দোষ লক্ষ্য করেছেন এমনকি এর আখ্যানগুলির নাট্য-সম্ভাবনা সম্পর্কেও তাঁরা হার্টেলের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। [১৯]

এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পর্যন্ত সবাই জানতেন কালিদাসই ভারতের প্রাচীনতম নাট্যকার। এই ধারণা ভেঙে গেল ভাসের নাটক, অশ্বঘোষের নাটক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। অশ্বঘোষের নাটক ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম-নির্দেশ অনুসারী। কিন্তু ভাসের নাটক সেদিক থেকে মৌলিকতার দাবী রাখে। ভরতের সঙ্গে ভাসের কোন পরিচয় বোধ হয় ছিল না। সুতরাং ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রের' আগেই যে ভাসের নাটকগুলি রচিত হয়েছিল বলে যে কেউ কেউ অনুমান করেন, তা একেবারে অযৌক্তিক নয়। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' কোন নাটকের নাম নেই। কিন্তু তিনি তিনপ্রকার লোকরঞ্জক রীতির মধ্যে নটকর্মের কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। নটেদের আচার-আচরণ সম্পর্কেও তিনি কতকগুলি মন্তব্য করেছেন। 'রঙ্গ' স্থলের উল্লেখটিও এখানে কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এসব উল্লেখ থেকে এই ধারণাই সিদ্ধ হয় যে, পতঞ্জলির সময় নটকর্ম একটি জীবিকারূপে পরিগৃহীত হয়েছিল, যদিও নটেদের সামাজিক মর্যাদা তেমন ছিল না। নটকর্মের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হতেন, তাঁরা উচ্চসম্প্রদায় ভুক্ত লোকও বোধ হয় ছিলেন না। পাণিনির দুটি নটসূত্রের উল্লেখ থেকে একথা অনুমান হয় যে, তাঁর সময়ে জনসমাজে নাট্যচর্চার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল, যে কারণে তদানুষঙ্গী 'নটসূত্র' জাতীয় গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়েছিল। পাণিনির সমসাময়িক বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণের পক্ষে 'নৃত্য-গীত-বাদিত্র' ও 'পেক্ষা' নিষিদ্ধ করেছিলেন বলে যে কথিত আছে, সে কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হবে। তখনকার দিনের শিষ্ট সমাজ কেমন ছিল, আমরা জানি না, তবে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মানুসারী উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের চাইতে নৃত্য-গীত-বাদ্য-অভিনয় কলার প্রচলন ও অনুশীলন লোকজীবনেই বেশি হত বলে অনুমান করা যায়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিনয়ের বহুলতা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি। বুদ্ধদেবের নিষেধ সত্ত্বেও বৌদ্ধ সম্প্রদায় নাট্যাভিনয় ত ছাড়েই নি, বরং বুদ্ধদেবকেও তাঁরা নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ বানিয়ে ছেড়েছেন, তাও আমরা জানি। নাট্যাভিনয় শেষপর্যন্ত বৌদ্ধসমাজে পরিগৃহীতই হয় নি, ধর্মপ্রচারের মাধ্যম রূপেও পরিগণিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব যে কর্মকাণ্ড প্রধান বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের

পরিবর্তে তাঁদের প্রধান মন্ত্র-ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তাতে স্বাভাবিক কারণেই বেশী করে সাড়া দিয়েছিল সেদিনকার সাধারণ মানুষ। আর এই সাধারণ মানুষগুলিই ছিল নাট্যকলার পোষক, ধারক ও বাহক। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভবের আগে অভিনয় চর্চার ধারাটিকে এই সাধারণ মানুষই বহমান রেখেছিলেন আর এই ধারা অনুসরণ করেই ক্রমে পূর্ণাঙ্গ নাটক বিকশিত হয়ে উঠেছিল। লোকনাট্যের ধারাটি সংস্কৃত নাটকের স্রোতে মিশে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি কখনই। লোক জীবনের আনন্দ নিঃসন্দী নাট্যধারা নানারূপে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখে এসেছে একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত। লোকনাট্যের লিখিত রূপ সর্বদা পাওয়া যায় না, অনেক মুখে মুখেই রচিত হয় এবং এভাবেই পুরুষানুক্রমে অনুশীলিত হয়। মধ্যযুগের বাংলা যাত্রার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে যাঁরা অবহিত আছেন, তাঁরাই ব্যাপারটি আন্দাজ করে নিতে পারবেন। লোকনাট্যের প্রধান ভেই হ'ল নৃত্যগীতময়তা। কথার চাইতে নাচ-গানের মাধ্যমে দর্শকজনচিত্তকে আনন্দদান করাতেই লোকনাট্যের ঝোঁক বেশী। প্রাচীন ভারতের লোকনাট্যেও এই বৈশিষ্ট্যটি অনুপস্থিত ছিল না। মহাভাষ্যকার এই কারণেই বলেছেন - 'নটস্য গাথাং শৃণোতি", "আগমিন্ নটঃ" ইত্যাদি। লোকনাট্যের গাথীতিক বৈশিষ্ট্যটিকে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতও একেবারে বাদ্যাৎ করতে পারেন নি। ব্রহ্মার কাছ থেকে নাট্যবেদ লাভ করে ভরত তাতে যে তিনটি বৃত্তির সঙ্গে চতুর্থ বৃত্তিটি যোগ করলেন, সে গুলির মূলও যে ভরত, সাত্বত, আরভট ও কৌশিক - জনগোষ্ঠী, সেকথা পন্ডিতগণ অনুমান করেছেন।[১০]

সংস্কৃত ভাষায় 'নৃ' শব্দ থেকে 'নৃৎ' এই ধাতুটি নিষ্পন্ন হয়েছে। যার অর্থ হল - নাচা। কিন্তু অভিনয় করা অর্থে কোন ধাতু সংস্কৃতে নেই। 'নাটক' শব্দটি যে 'নট্' ধাতু থেকে জাত, তার মূল কোন অনার্য ভাষা। প্রাকৃত 'নট্' ধাতুর মূল 'নর্ৎ' ধাতু, যার অর্থ নৃত্য করা। প্রাকৃত 'নট্' ধাতু সংস্কৃতে পরি-গৃহীত হয়ে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক 'নাটিকা', পুংলিঙ্গ বাচক 'নট্' এবং অনুকরণ বা মূকাভিনয় অর্থে 'নাট্য' এবং অভিনয় অর্থে

নাট্যবৃত্তি' শব্দের সৃষ্টি বলে মনে করেছেন কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত। [26] যাই হোক, শব্দটি সম্ভবতঃ পাণিনির আগেই সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছিল। অভিনেতা অর্থে 'নট' শব্দের মূল যদি অনার্য ভাষা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই অনার্য সমাজে এই নটবৃত্তি বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল।। এদেশে আর্যাভিযান মোটামুটি সম্পন্ন হলে, আর্য-অনার্য বিরোধ-বিগ্রহ শান্ত হলে, উভয়ের মধ্যে কিছু সাংস্কৃতিক দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল, হওয়াটাই স্বাভাবিক। অনার্যরা যেমন আর্যদের কাছ থেকে কিছু নিয়েছে, আর্যরাও অনার্যদের উন্নত কৃষ্টির কিছু কিছু নিয়েছে। অনার্যদের বিভিন্ন কৃষ্টির মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য স্থাপত্য বিদ্যা এবং দ্বিতীয় হল নৃত্য-গীতাদি কলাচর্চা। স্থাপত্য-বিদ্যায় যে অনার্যরা আর্যদের থেকে অনেক উন্নত ছিল তার উদাহরণ পাওয়া যায় আধুনিক দক্ষিণ ভারতে। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য কলা ও নৃত্য-গীতাদিতে দক্ষতা তাঁদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকার বলে মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। নৃত্য-গীতাদির প্রতি আর্যগণের অনুরাগের যে সব উদাহরণ বেদাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়, সেই অনুরাগ প্রভূত পরিমাণে অনার্য সংস্পর্শজাত বলেই মনে হয়।

ব্রহ্মা যে নাট্যবেদটি রচনা করেছিলেন তার প্রাথমিক অবস্থায় সম্ভবতঃ সঙ্গীতের ততটা উল্লেখ্য স্থান ছিল না। যদিও পিতামহ বলেছেন, অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তিনি সামবেদ থেকে সঙ্গীতও নিয়েছিলেন এই নাট্যবেদ রচনায়। আচার্য ভরত তার সঙ্গে সঙ্গীতাত্মক আরও তিনটি বৃত্তি যোগ করলেন। ব্রহ্মার কথায় যোগ করলেন 'কৈশিকী' নামক চতুর্থ বৃত্তিটি। তাহলে এগুলি বোধ হয় তখন খুবই অনাড়ম্বর ছিল। নাট্যশাস্ত্রকার প্রাথমিক ভাবে এগুলিকে বাদ দিলেও পরে এগুলির অপরিহার্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। সঙ্গীতকে গ্রহণ করা হলেও নৃত্যের স্থান গৌণই ছিল বলে মনে হয় এই নাট্যশাস্ত্রে। নৃত্যকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মাও মনে মনে স্বস্তি অনুভব করেন নি। এই কারণেই তিনি শিবের অনুমোদনের জন্য ততটা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। 'অমৃত মন্থন' নাটকের অভিনয় দেখে দেবতারা উচ্ছসিত প্রশংসা করলেও ব্রহ্মা তাতে সন্তুষ্ট

হতে পারেন নি । তিনি শিবকে দেখানোর জন্য নতুন নাটক লিখলেন 'ত্রিপুরদাহ' । নাট্যাভিনয় ভাল হলেও তাতে নৃত্যের অভাব থাকায় শিব সেই নাট্যানুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলতে পারেননি। তখন ব্রহ্মার অনুরোধাতিশয্যে শিব ভরতকে নৃত্যের অঙ্গহারাদি শিখিয়ে দিতে বললেন শিষ্য তণ্ডুকে । নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের সুষম ব্যবহারে সৃষ্টি হল তাণ্ডব নৃত্যের । নাটকের সঙ্গে নৃত্য যুক্ত হল । নাট্যশাস্ত্রের এই বিবরণ নিছক একটি গল্পমাত্র নয় বলেই মনে হয় । নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির প্রতি জনসাধারণের অনুরাগকে প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকার একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি । লোকনাট্যোচিত নৃত্য-গীতাদির বাহুল্যকে বহুলাংশে হ্রাস করা গেলেও একেবারে বর্জন করা যায় নি । উনিশ শতকে আধুনিক রীতির বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছিল । পাশ্চাত্য আদর্শে আধুনিক বাংলা নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই , কিন্তু নাট্যকারগণ বাঙালী দর্শকের চিরাগত সঙ্গীতপ্রীতিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি । মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাটকের উপস্থাপনায়ও সঙ্গীতকে স্থান দিতে হয়েছে এই অনিবার্য কারণেই । গিরিশচন্দ্রও দর্শকরুচির পোষকতা করতে গিয়ে নৃত্য-গীতাত্মক লোক-নাটককেই মঞ্চে তুলে এনেছিলেন ।

নাটকের উৎপত্তি কবে , কোথায় , কিভাবে হয়েছিল , তা কারুর পক্ষেই নিশ্চয় করে বলা আজ আর সম্ভব নয় । এর মূলে কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার অবদান যে কতটা , কতটাই বা মানুষের স্বাভাবিক অনুকরণ-প্রবৃত্তি জাত তা নিয়ে দেশে - বিদেশে প্রচুর পাণ্ডিত্য চর্চা হয়েছে । দেবোৎসব থেকে অভিনয় কলার উদ্ভব - এমন মত পাশ্চাত্য নাটকের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । মোটামুটি ধর্মীয় পরিবেশ থেকেই বিশ্বের সবদেশের নাটকের জন্ম- এই মতের পোষকতা করতে গিয়ে মিশরের " Abydos passion plays " ২২ পর্যন্ত পৌঁছুনো গেছে । সেখান থেকে গ্রীসের Dionysus এর উৎসবকে কেন্দ্র করে নাচ গান থেকে ট্র্যাজেডি - কমেডির সৃষ্টি এবং ইংল্যাণ্ডে নবম শতাব্দী থেকে গীর্জার পরিবেশে passion plays , Miracle plays ও Morality plays গুলির উদ্ভব এবং এই ধারাপথে পঞ্চদশ শতাব্দীর

মাকামারি ইংরেজি নাটকের সৃষ্টি – এই সকল সিদ্ধান্তই পাশ্চাত্য নাটকের উদ্ভবের মূলে স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু এমন সকল সিদ্ধান্ত প্রাচ্য, বিশেষ করে, ভারতীয় নাটকের উদ্ভবের মূলে করা যাচ্ছে না বলেই পণ্ডিতগণের মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে। তবুও ঋগ্বেদের সংবাদ – সূক্তগুলিকেই ভারতীয় নাটকের আদি রূপ ধরে এবং অশ্বমেধ – মহাব্রত যজ্ঞানুষ্ঠানে অভিনয়গুলির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ধর্মীয় পরিবেশেই যে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় নাটকের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল – এরূপ মত প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়েছেন অনেকেই।[৬] কিন্তু ভারতবর্ষের আদিবাসিন্দা উন্নত কৃষ্টি সম্পন্ন অনার্যগণের সম্ভাব্য প্রভাব সম্ভাবনাটিকে সকলেই সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। ধর্মীয় পরিবেশে নাটকের বিকাশ অসম্ভব নয়, কিন্তু ভারতীয় নাটকের উদ্ভব যে এ ভাবেই হয়েছিল, তা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। যাকে আমরা ভালবাসি তাঁকে আমাদের জীবনের সবচেয়ে ভাল জিনিসগুলি উৎসর্গ করে তৃপ্তি পাই। নৃত্য-গীত-বাদ্য-অভিনয় কলা – এগুলি আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল। এগুলিও দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করেই আমরা অপার্থিব আনন্দ অনুভব করি। দেবতার আনন্দের অংশীদার হয়েই আমরা কৃত-কৃতার্থ হই। সুতরাং দেবতাকে নিয়ে নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে রসময় প্রভাতকুসুমের মত নাটকের ফুল ফুটে উঠেছিল – এই মত যতই মস্তিষ্কচর্চার ফল হোক না কেন, খুব স্বাভাবিক মনে হয় না। আগেই বলেছি, অনুকরণবৃত্তি থেকেই অভিনয় কলার উদ্ভব। এই অভিনয় আনন্দ কর। আনন্দদায়ক এই বস্তুটিই পরিশীলিত রূপে দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হয়েছিল। সেটা অনার্য ভারতে পশুপতিনাথের উদ্দেশেও হতে পারে, আর আর্য ভারতে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞীয় পরিবেশেও হতে পারে। যজ্ঞ স্থলে যে অভিনয় হত, তার মুখ্য লক্ষ্য ছিল উদ্দিষ্ট দেবতাকে প্রীত করা, গৌণ লক্ষ্য ছিল জনমনোরঞ্জন। অনুচিকীর্ষাকে যদি মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলে স্বীকার করি, তাহলে আর্যরাও এই স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিরহিত ছিল না, নিশ্চয়ই। তারাও এই অভিনয় ব্যাপারটা জানত কিন্তু অনার্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে তা ক্রমে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই ধারণাটি

অনুকরণে নয়, অনার্যমূল 'নট্' ধাতু, নাট্যশাস্ত্রের চতুর্বিধা উপজাতীয় - মূল বৃত্তি, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নাট্যানুশীলনের জনপ্রিয়তা এই ধারণারই পরিপোষক।

সংস্কৃত নাটকের জন্ম একদিনে হয় নি। ভাস - অশ্বঘোষ সৃষ্টির আগে সুদীর্ঘকালের প্রস্তুতির ধারাটি আমাদের সামনে উপস্থিত নেই। আমরা জানিনা - কিভাবে সংস্কৃত নাটক পুষ্পিত বিকশিত হয়ে উঠেছিল। যে ভাবেই তা হয়ে থাক, তা লোক জীবন থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। ঋগ্বেদের সংবাদ সূক্তগুলির সঙ্গে পরে পরে নাচ-গান যুক্ত হয়েই নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল বলেও হয়ত অনুমান করা যায়, তেমন অনুমান করেছেনও কেউ কেউ, [২৪] কিন্তু নাটক সৃষ্টির মূলে লোকজীবনের অনুষঙ্গটিকে অস্বীকার করা যাবে না কোন মতেই।

ভারতীয় নাটকের উদ্ভবের মূলে পুতুল নাচ (Puppet Play) ছায়ানাট্য (Shadow Play.), যাদুবিদ্যা প্রভৃতির অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন. অনেকেই। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কও হয়েছে যথেষ্ট। এই সব মত - অমতের কাঁটাবনে পা না দিয়েও এই একটি কথাই বলা যায় যে, যে কোন শিল্পকলাই মানুষ আগে নিজে অনুশীলন করে তাকে রপ্ত করে, পরে অন্যত্র তার প্রয়োগ করে। এই প্রয়োগটাকে বলা যায় আধ্যানুকরণ। গান আগে আসে, পরে আসে বাদ্য। তেমনি অভিনয় আগে।, পরে তাকে পুতুলেই হোক বা ছায়ানাটকেই হোক প্রয়োগ করা সহজ হয়। পুতুলকে নাচাতে হলে আগে নিজের নাচ জানতে হয়। পুতুলের নাচ দেখে কেউ নাচতে শেখে না, শেখেওনি, আর তা শেখা সম্ভবও নয়। সহজ এবং স্বাভাবিক পথেই নাটকের উদ্ভব হয়েছিল - পুতুল নাচ থেকেও নয়, ছায়াবাজি বা যাদুবিদ্যা থেকেও নয়।

সংস্কৃত নাটকে গ্রীক প্রভাব আছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন ভেবার -। তাঁর এই মত পিশেল, উইনডিশ্ প্রমুখ পণ্ডিতগণের দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত ও পরিত্যক্ত হয়েছে। সংস্কৃত নাটক গ্রীক প্রভাবজাত না হলেও, প্রশ্নটিকে একেবারে এককথায় নস্যাৎ করা যায় না। আভ্যন্তরীণ ও বহিরঙ্গ

উভয়দিক থেকেই গ্রীক নাটকের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ার মত । প্রকৃতপক্ষে আলেকজান্ডারের ভারতবিজয়ের পর থেকেই সংস্কৃত নাটক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে । বিশেষ করে, খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে মিনেন্ডার-এর শাসনকালেই ভারতবর্ষের উপর গ্রীকপ্রভাব ব্যাপকতর হয় । এই সময় ভারতের সঙ্গে গ্রীক সাম্রাজ্যভুক্ত আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে । এদেশে আগত বা কোন কোন রাজন্যবর্গের দ্বারা আনীত গ্রীক সৈন্য বাহিনীর মধ্যে অথবা তাদের দ্বারা দেশীয় রাজাদের সভায় গ্রীক নাটকের অভিনয়াদিও যুক্ত হত । আলেকজান্ডার নিজেই নাট্যানুরাগী ছিলেন বলে জানা যায় । সুতরাং তাঁর সৈন্যবাহিনীতে এবং তাঁর অনুগামীদের মধ্যে এই শিল্পচর্চার সম্ভাবনা একেবারে অসম্ভব নয় । ইতিহাস থেকে এও জানা যায় যে, আলেকজান্ডারের সঙ্গে অনেক কুশলী শিল্পী ভারতবর্ষে এসেছিলেন । এঁরা রীতিমত নাট্যাভিনয় করতেন । এইসব অনুষ্ঠান প্রথমদিকে গ্রীকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমশঃ গ্রীক সম্পর্ক বাড়তে থাকলে তা এদেশীয় শিল্পরসিকদেরও আকৃষ্ট করেছিল । আঠার-উনিশ শতকের বাংলাদেশে ইংরেজ আধিপত্যের কালে এভাবেই এদেশীয়গণ ইংরেজি নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিলেন । দেশীয় নাট্যরীতি তাঁদের নাট্যরস পিপাসাকে আর তৃপ্ত করতে পারছিল না। ইংরেজি নাটকের সংস্পর্শজাত তাঁদের নবলব্ধ নাট্যরস পিপাসাই উনিশ-শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক রীতির নাটকের জন্মকে সম্ভাবিত করেছিল । এর সঙ্গে দেশীয় ঐতিহ্যের সম্পর্ক যতটা না ছিল, পাশ্চাত্য রীতির নাটকের সঙ্গে ছিল ছিল অনেক বেশী । খ্রীঃ পূর্ব প্রথম শতাব্দীর ভারতীয় পরিবেশটি যদি তদ্‌নুরূপ থেকে থাকে, তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । বিদগ্ধ সমাজ যদি সেদিন গ্রীক নাটকের মধ্যে দেশীয় রীতির প্রতিবিম্ব কিছু পেয়ে থাকেন এবং সেই নবলব্ধ উপকরণ সমূহকে আত্মীকৃত করে নতুন ধরনের নাট্যসৃষ্টি করে থাকেন, তবে তাকে নিন্দা করব কেন ? গ্রহণ-বর্জনই ত' সাহিত্য ধর্ম । গ্রহণ ব্যাপারটা যদি আত্মীকৃত হয়ে স্বরূপ পরিগ্রহ করে এবং রসের সহায়ক হয় তবে তাকে বিদেশী

বলে অপাংক্তেয় করে রাখার মানসিকতাই ও কূপমণ্ডূকতা । সংস্কৃত নাটকে গ্রীক প্রভাবের পরিমাণ নিয়ে অনেক আলোচনা, বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে । এসব নিয়ে হয়ত পরেও অনেক আলোচনা হবে, কিন্তু তাতে সংস্কৃত নাটকের শ্রেষ্ঠত্বের কোন হানি হবে না ।

সংস্কৃত নাটক সৃষ্টির আগে অবসর বিনোদনের জন্য প্রাচীন ভারতের জনগণ নানাবিধ আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করত । পতঞ্জলির ভাষ্যে তিনটি লোকরঞ্জক শাখার কথা আমরা জেনেছি । অভিনয়, গ্রন্থ্য দর্শন, কথকতা - এতে নৃত্য-গীত-বাদ্যও ছিলই । ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যার চর্চাও ভারতের বহু পুরণো সংস্কৃতি । পুতুল নাচও হয়ত প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল । এই প্রসঙ্গে সূত্রধারের কথাটা একটু আলোচনা করা যেতে পারে । সংস্কৃত নাটকে সূত্রধার চরিত্রেরপ্রাধান্য লক্ষ্য করে পুতুল নাচ থেকেই নাটকের সৃষ্টি অনেকেই বলেন, সুতো ধরে পুতুল নাচানো হয় বলেই পুতুল নাচিয়েকে সূত্রধার বলে, এই সূত্রধারই নাট্যপরিচালক । সংস্কৃত নাটকেও নাট্যপরিচালকের ভূমিকায় থাকে এই সূত্রধার । সুতরাং এই সূত্রধারের উপস্থিতির মূলধনেই পুতুলনাচের কাছে সংস্কৃত নাটকের ঋণীতদাসত্ব । কিন্তু এবিষয়টাকে যদি একটু ভিন্ন ভাবে দেখা যায়, তাহলে আমরা কি দেখি ? সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার চরিত্রটি একাধারে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, প্রধাননট, নটাগ্রণী, নাট্যাচার্য, মঞ্চাধ্যক্ষ । নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞানের অধিকারী । নাট্যশাস্ত্রকে আচার্য ভরতের আগে বলা হত নটসূত্র । সুতরাং নটসূত্র বা নাট্যসূত্র বা নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ ধারণা যাঁর আছে, তাঁকেই সূত্রধার বলা যুক্তি সঙ্গত । 'সূত্রধার' শব্দটি'র অর্থ ও তাৎপর্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । তাছাড়া 'সূত্রধার' শব্দটি একাধিক অর্থবোধক হওয়ায় রুচি-পছন্দ মত বিভিন্ন-জন বিভিন্ন ভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন । প্রাচীন ভারতীয় লোকনাট্যে এই সূত্রধার চরিত্রটি ছিল কি না, আমরা জানি না । তবে তাদের নাটকগুলিতে 'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ' দেখে মনে হয় ভারতীয় নাটকে এই সূত্রধারের

ঐতিহ্য বহু প্রাচীন ।

প্রাচীন ভারতে লোকজীবনে প্রমোদ বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল নাট্যাভিনয় । এই লোকাভিনয়ের ধারা পথেই হোক , বা অন্য যে কোন ভাবেই হোক , একসময় সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব হয়েছিল । কিন্তু সংস্কৃত নাটকগুলি সর্বসাধারণের রসোপভোগের সামগ্রী ছিল না । সংস্কৃত লোকজীবনের ভাষা ছিল না কোন কালেই । সংস্কৃত নাটকের রসোপভোগের জন্য দর্শককে যতটা পরিশীলিত ও বিদ্যাবৈদগ্ধ্যের অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন হত - সে রকম লোকের সংখ্যা সবসময়ই মুষ্টিমেয় । রাজসভায় বা বিদগ্ধ সমাজ ছাড়া এই নাটকগুলির অভিনয় সাফল্য কোনমতেই সম্ভব ছিল না । এই কারণেই সংস্কৃত নাটকগুলি যতই উৎকৃষ্ট শিল্প-কলাকৌশলের ও ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে গণ্য হোক না কেন , তাকে জাতীয় সাহিত্য বা জাতীয় নাটক বলে অভিহিত করা যায় না । মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ সমাজের বাইরে যে বৃহৎ অর্ধশিক্ষিত , অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনসমাজ ছিল (প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য , সংস্কৃতবিদ্যা উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল) , তারা তাদের প্রমোদ বিনোদনের উপায় হিসেবে যে মাধ্যমগুলি বেছে নিয়েছিল , তার মধ্যে অভিনয়চর্চাও নিশ্চয়ই ছিল । রামায়ণ-মহাভারত বা পুরাণের কাহিনী নিয়ে কথকতাও একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল । এই পৌরাণিক কাহিনীগুলি লোকাভিনয়েরও বিষয়ীভূত ছিল । পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কংসবধের ঘটনা নিয়ে , বলি বন্ধনের ঘটনা নিয়ে যে নাট্যাভিনয়ের কথা পাই তা সম্ভবতঃ এই ধরনের লোকনাট্যই ছিল । লোকনাট্যের লিখিত রূপ একান্তে যেমন সহজলভ্য নয় , সেকালের নিরিখে ভেবে দেখলে তা যে আরও দুর্লভ ছিল , তা সহজেই অনুমেয় । লোকনাট্যের এই ধারাটি কোন কালেই লুপ্ত হয়ে যায় নি। সংস্কৃত নাটকের পাশাপাশি এই ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে উত্তর কালে - একেবারে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ।

সংস্কৃত নাটকের সুবর্ণযুগেও লোকনাট্যের চর্চা অব্যাহত ছিল। মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ সমাজের বাইরে বৃহত্তর লোক জীবনে এই ধরনের নাট্যচর্চা যে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে তার কিছু কিছু ইঙ্গিত ও উল্লেখ

পাওয়া যায়। দশ প্রকার শিষ্ট সংস্কৃত নাটক ছাড়াও যে আরও কয়েক প্রকারের নাটক সমাজে প্রচলিত ছিল তার পরোক্ষ ইঙ্গিত ভরত নিজেই তাঁর নাট্যশাস্ত্রে করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণাকে প্রধানতঃ সংস্কৃত নাটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন, তবু অন্ততঃ সত্যের খাতিরে লোকনাট্যের অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। দশম শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্র 'দশরূপক' এর রচয়িতা ধনঞ্জয় মূলতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্রোক্ত দশ প্রকার শিষ্ট সংস্কৃত নাটকেরই আলোচনা করেছেন। কিন্তু ধনঞ্জয়ের সমসাময়িক বলে অনুমিত 'নাটক-লক্ষণ-রত্নকোষ' প্রণেতা সাগরনন্দী একেশগুলি লোকনাট্যের নামোল্লেখ করেছেন। অবশ্য স্বাভাবিক কারণেই এই সব নাটকের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর 'সাহিত্য দর্পণ'কার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রচলিত এই লোকনাট্যগুলিকে আঠারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তিনি এগুলিকে বলেছেন - 'উপরূপক'। এই উপরূপকগুলির আঙ্গিক, সংলাপ উপস্থাপনারীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দশরূপক থেকে আলাদা। আরও লক্ষণীয় যে, এগুলির মধ্যে ত্রোটক, গোষ্ঠী, হল্লীশ, নাট্যরাসক, প্রস্থান প্রভৃতিতে নৃত্য-গীত-বাদ্য নাট্যাভিনয়ের একটা মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। সাগরনন্দী যে লোকনাট্যগুলির নামোল্লেখ করেছেন কিন্তু শ্রেণী বিভাগ করেন নি, সেগুলির ও বিশ্বনাথের শ্রেণী বিভাগ করা উপরূপকগুলিরও দু' একটি ছাড়া আর কোনটিই পাওয়া যায় নি।

সংস্কৃত নাটকের অত্যুচ্চ ভাবকল্পনাময় বিষয়বস্তু লোক-মানসের অনুকূল ছিল না কোন কালেই। একমাত্র 'মৃচ্ছকটিক' ও 'মুদ্রারাক্ষস' এই দুটি ছাড়া সংস্কৃত নাট্য সম্ভারের অধিকাংশ নাটকেরই বিষয় বস্তু ছিল রোমান্টিক প্রেম। এই রোমান্টিক প্রেমের উৎকর্ষ প্রতিপাদনের জন্য নাট্যকারগণ তাঁদের পরিশীলিত কবিত্ব প্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছেন, খুব স্বাভাবিক কারণেই যা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। [১৫] ব্যবহারিক জীবনের সুখ-দুঃখকে বাদ দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে যে নাট্যচর্চা হত তাকে সাধারণ মানুষ রাজা-রাজড়ার ও পণ্ডিতদের বিষয় বলেই বিবেচনা করত। লোকনাট্যের বিষয়-

বস্তুতে লোকমানসের প্রতিফলনই কাম্য। ধর্মীয় তথা পৌরাণিক বিষয়ের প্রতি লোক-মানসের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। রাম ও কৃষ্ণকথা সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় লোক-মানসকে নানা ভাবে উজ্জীবিত করেছে। মহাকাব্যের যুগের পর তা আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেই কৃষ্ণকথা নিয়ে লোকাভিনয়ের কথা আমরা পতঞ্জলির লেখায় পেয়েছি। এই মানসিকতা উত্তরকালের নাট্যচর্চায়ও নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু লোক-নাট্যেই নয়, পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনী নিয়ে নাট্যরচনা সংস্কৃতেও কম হয় নি। পৌরাণিক প্রসঙ্গ ছাড়া ব্যবহারিক জীবনের প্রসঙ্গ অবলম্বন করেও লোকনাট্য রচিত হত। বিশ্বনাথ যে উপরূপকগুলির কথা তাঁর "সাহিত্য দর্পণে" উল্লেখ করেছেন সেগুলির অধিকাংশের পাত্র-পাত্রীই সাধারণ স্তরের মানুষ। এই সব নাটকের বিষয়বস্তু যে ঠিক ঠিক কি ছিল, তা না বলা গেলেও এগুলি যে সংস্কৃত নাটকের মত রোমান্টিক প্রেমের গল্প-সর্বস্ব ছিল না, তা নিশ্চয় করে বলা যায় এগুলির পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের রূপ দেখেই।

সংস্কৃত নাটকে কাব্যের প্রাধান্য থাকলেও ভরত নৃত্য-গীতকে প্রাধান্য দেন নি। নৃত্য-গীতের বাহুল্যকে তিনি নাটকের ঈপ্সিত রসসৃষ্টির প্রতিকূল বলে গণ্য করেছেন। বিদগ্ধজনের কাছে নৃত্য-গীতের চাইতে কাব্যের আবেদন বেশী কিনা জানিনা, লোক মানসে কাব্যের চাইতে নৃত্য-গীতের আকর্ষণই বেশী। লোকনাট্য নৃত্য-গীতকে ও পরিহার করেইনি, বরং নৃত্য-গীত-বাদ্যই ছিল লোকনাট্যের প্রাণ। প্রাচীন ভারতের নটেরাও যে গান গাইত, গানই তাদের পেশা ছিল, তা ও 'জায়াজীব নটঃ। জায়াজীবদ্ধ ধনম্' ইত্যাদি থেকেই উপলব্ধি করা যায়। অন্য শিল্পগুলির কথা ছেড়ে দিলেও, সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে লোকনাট্য ধারার এখানেই একটা বড় রকমের পার্থক্য। সংস্কৃত নাটকের ধারা ভাস-অশ্বঘোষ (যেহেতু তার আগের সংস্কৃত নাটকের কথা আমাদের জানা নেই) থেকে বাহিত হয়ে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এসে ক্ষীয়মাণ হয়েছে।

নবযুগের জাতীয় নাট্যধারা অন্যরকম। সে ফুল দেশী নয়। দেশী মাটীর খাতে বিদেশী গাছে বিদেশী রূপের ফুল। তার রূপ আলাদা, গন্ধ আলাদা। কিন্তু সুপ্রাচীন লোকনাট্যের ধারাটি সর্ব জনে নৃত্য-গীতের সুর-ছন্দ ফুটিয়ে তুলে প্রবাহিত হয়ে আধুনিক ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে আঞ্চলিক রূপ ধরে আজও বর্তমান আছে।

---------------------- X ----------------------

সূত্র - নির্দেশ

১। "The date of the text (Natya Sastra) is uncertain, but we cannot with any assurance place it before the third century A. D."

— A.B.Keith: The Sanskrit Drama, p. — 15.

২। বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ৩৭০ – ৪১০ খ্রীঃ পর্যন্ত।

৩। H. Lüders, Bruchstücke buddhistischer Dramen (Königlich Preussische Turfan-Expeditionen, Kleinere Sanskrit texte) Berlin, 1911.

৪। দ্রষ্টব্যঃ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। পৃ – ৩৪৪।

৫। "প্রজুহিতব্যম্ ন চ সমাজো কটব্যো বহুকম্
দোসং সমাজম্হি পসতি দেবানং পিয়ো পিয়দসি রাজা।"

৬। " অস্তি পিতুএ কচা সমাজা সাধুমতা দেবানং পিয়স।"

৭। " শৈলূষিকাঃ নাটয়তে ব্রাত্যং কর্মং বাচয়ন্তি, ব্রাত্যং
চ বলিং বধ্নন্তীতি " ৩।১।২৬।

৮। " রঙ্গানুকারিণাং নটানাং ব্যাখ্যানোপাধ্যায়াঃ"-কৈয়ট।
অধ্যাপক Levi কৈয়টের ব্যাখ্যাকেই অনুসরণ করেছেন।
Lüders-এর মতে এঁরা ছায়াবাজীকর।
Keith = নট।

৯। Keith: S.D. P.31.

১০। নট-নাট্য-নাটক, পৃ-১৫।

১১। " চিত্রলেখকা অপি চিত্রস্থং কংসং চাক্ষুষবৃত্ত্যৈব বুদ্ধ্যা ঘাতয়ন্তীত্যর্থঃ"-কৈয়ট।

১২। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের কাল ও রচয়িতা নিয়ে পণ্ডিতমহলে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। Jacobi, ভিনসেন্ট স্মিথ, টমাস মেয়ার, শ্যামশাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে কৌটিল্য স্বয়ং অর্থশাস্ত্রটি প্রণয়ন করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (আঃ ৩২৪ - ৩০০ খ্রীঃপূঃ) আমলেই। কিন্তু উইনটারনিৎস, কীথ প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে গ্রন্থটি খ্রীস্টাব্দ প্রথম থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে কোন এক সময়ে রচিত, পরে কৌটিল্যের নামে প্রচারিত হয়। এই সব মতামত পর্যালোচনা করে এবং বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক প্রমাণ করেছেন যে, অর্থশাস্ত্র খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থশতাব্দীতে স্বয়ং কৌটিল্যই রচনা করেন।

দ্রঃ ভূমিকা: কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, পৃ ১৵০ - ২।৵০

১৩।* "গীতবাদ্যনৃত্যনাট্যাক্ষরচিত্রবীণাবেণুমৃদঙ্গপরচিত্তজ্ঞানগন্ধমাল্যসংযূহনসম্বাহনবৈশিককলাজ্ঞানানি গণিকা দাসী রঙ্গোপজীবিনীশ্চ গ্রাহয়তো রাজমণ্ডলাদাজীবং কুর্যাৎ।" - অর্থশাস্ত্র, ২।২৭।

১৪। পাণিনির আবির্ভাব কাল নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। গোল্ডস্টুকার তাঁকে খ্রীঃ-পূর্ব ৮ম শতাব্দীর এবং ম্যাক্সমুলার, ওয়েবার প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাঁকে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকের বলে মনে করেন। তবে খ্রীঃ পূঃ ৫ম - ৬ষ্ঠ শতকেই তিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনা করেছিলেন বলে অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত।

১৫। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ওয়েবার, স্টেন কোনো প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে 'নটসূত্র' শব্দটি নৃত্যশিল্পী ও মূকাভিনেতাদের সম্পর্কেই প্রযুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে, Sylvan Levi ও Hillbrandt. এঁর মতে এই সূত্রগুলি নাট ও অভিনেতা সম্পর্কিত।

১৬। " It on the history it is known that on a one festive occasions the ancient people sometimes used to commemorate incidents of national importance or exploits of some national hero by means of mimic representations . The mimic representation of the scaring away of the Soma-seller by pelting clods in Soma sacrifice is a pointer in this matter . Obviously such mimic representations by the passage of time, developed into drama "

Dr. Kali Kumar Dutta ; foreward to " নাট্যকলার ক্রমবিকাশ " ।

১৭। " It would be absurd to ignore in this regard the dialogue between the Brahmin and the hetaera in the Mahavrata , where the exchange of coarse abuse is intended as a fertility charm ."

A. B. Keith ; The Sanskrit Drama , P. 30.

১৮। 'নট - নাট্য - নাটক' । পৃ. ৩ ।

১৯। ঐ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :-

" The Suparnadhyaya (Suparna , Suparnakhyana)is an apocryphal work of the late Vedic period , of which the author spasmodically tries to imitate the hymns of Rgveda in respect of the language , accentuation and external form , with the intention of letting his work pass for one as belonging to Rgveda . The age of his work is wholly indefinite , and the opinion of Hertel that it is more than 2500 years old has not been proved. Hertel tries to prove that the poem , the theme of which is

The well-known puranic story of Kadru , Vinata and snakes and from whic h he has also given a German rendering shows the existence of a dramatic poetry , that served as the connecting link between the "Vedic drama " The dialogue - verses of the Rgveda and the classical drama . But the text that we have merely a series of ballad . It is possible that it was meant to serve for a dramatic representation . " H.I.L. of History of Indian Literature , M. Winternitz. vol. iii

pp. 180 - 81 .

২০। দ্রষ্টব্যঃ- ভা.টী." উজ্জ্বলনাট্যশাস্ত্র" । ১।৯ . পৃ - ৭ ।(নবপত্র প্র •)

২১। " The terminology of the drama further proves that in India too such dances were at the root of dramatic performances. The common word for 'drama ' in Sanskrit is the neuter nāṭaka , and the same word as masculine has exactly the s same meaning as naṭa "actor ", whilst nāṭya means "mimic " or "dramaturgy " and nāṭayati conveys the sense of " mimic representation ". All these words go back to the root nat, Prakrit form of the root nart , "to dance " .

HI.L. Winternitz . Vol- iii .- p. - 182 .

২২। " The Egyptians also had no drama and their so called 'passion play ' (c. 3000 B.C.) was no drama at all ".

Dr. Kali Kumar Dutta , forward to

'নাটক লক্ষণ রত্নকোষ । p.ii.

২৩। দ্রষ্টব্য - " The Sanskrit Drama, A.B.Keith , Chapter - "Religion and the Drama " - pp - 55 - 69 .

" These hymns (বৈদিক মন্ত্র সূক্তাদি) were combined with the dances in the festivals of the Gods , which soon assumed a more of less conventional form. Thus , from the union of dance and song, to which were afterwards added narrative recitation , and first sung the spoken dialogue , was gradually evolved the acted drama ."

Encyclopaedia Britannica : Cambridge Edn.

" The dramas that we possess are nothing less than popular , and they wholly belong to ornate poetry , and in fact are composed exclusively for the cultured public , and often they are straight way meant only for persons endowed with highly refined literary taste . "

H.I.L. : M.Winternitz, Vol - III
P. 234 .